দলিত সমাজ ও আম্বেদকর

অতীন ঘোষ

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫

প্রকাশিকা :

লতিকা সাহা । মডার্ন কলাম ।

১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর :

অনিলকুমার ঘোষ । নিউ ঘোষ প্রেস ।

৪/১ই, বিডন রো, কলকাতা-৬

বাবাসাহেব আম্বেদকরের স্নেহভাজন ও ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ্য—

শ্রীঅপূর্বলাল মজুমদার

করকমলেষু

কৈশোরের একটি দৃশ্য আজও আমার চোখের সামনে ভাসে। ঠাকুমা প্রতি পূর্ণিমাতে ৺সত্যনারায়ণের পুজোর আয়োজন করতেন, আমার সহপাঠী কিশোর ব্রাহ্মণ মাঝে মাঝে পুজো করতে আসত। দেখতাম ঠাকুমা গঙ্গাজলের ঘটি নিয়ে জল ছড়াতে ছড়াতে আসতেন পূজারী ব্রাহ্মণের আগে আগে। যাবার সময়ও তাই। অপর দৃশ্যটি সামান্য অন্য রকমের; বাড়ীর শৌচাগার পরিষ্কার করতে আসতো জমাদার। সে চলে যাবার পর ঠাকুমা তার চলে যাওয়ার পথে গোবরজল ছিটোতেন।

পুরোহিত এবং জমাদার দুজনেই বাড়ীতে আসেন গৃহস্থের কল্যাণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে। একজন অবাঙমানসগোচর এক ঈশ্বরের কৃপালাভের জন্য প্রার্থনা জানান, অন্যজন স্বাস্থ্যবিধির নিয়ম মেনে গৃহস্থের নির্মল জীবন-যাপনে কায়িক পরিশ্রম করে যান। পার্থক্য? কেন এই বৈষম্য? এই সব প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুমা বলতেন—এসব ভগবানের সৃষ্টি। তখন মেনেও নিতাম সে কথা। আজ মানি না, কারণ একটি মহান আত্মার সঙ্গে পরিচয়। বিংশ শতাব্দীর ভগীরথ আম্বেদকরের জীবন দলিত সমাজের মুক্তিকল্পে নিবেদিত। ব্যক্তি জীবনের ক্ষোভটুকু বাদ দিলে এমন একজন 'পরিপূর্ণ' মানুষ ভারতে খুব একটা জন্মান নি।

এই মহাপ্রাণের সংগ্রামী জীবনের সামান্যতমও যদি তুলে ধরতে পেরে থাকি এই গ্রন্থে তাহলেই আমার প্রয়াস সার্থক হবে।

অতীন ঘোষ

ভারতের সমাজব্যবস্থা

প্রাচীন যুগ

যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্ ।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরূ পাদ্য উচ্যেতে ॥ ১১
ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ ১২

ঋগ্বেদ ॥ দশম মণ্ডল ॥ নব্বই সূক্ত ॥ একাদশ ও দ্বাদশ ঋক ।

পুরুষ দেবতাকে খণ্ড খণ্ড করা হল....কটি খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছিল ? তাঁর মুখমণ্ডল থেকে উদ্গত হলেন ব্রাহ্মণ, দুই বাহু থেকে রাজন্য বা বীর ক্ষত্রিয়, দুই উরু থেকে জন্ম নিলেন বৈশ্য এবং পদদ্বয় থেকে উদ্ভূত হলেন শূদ্ররা ।

ঋগ্বেদের উপরোক্ত শ্লোক থেকে দেখা যাচ্ছে যে মস্তিষ্ক বা বুদ্ধির দ্বারা চালিত মানুষ দেহের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গেরই মত সর্বোচ্চ ও সর্বপ্রধানের আসন পেয়েছিলেন। বাহু শক্তি ও কর্মের প্রতীক, তাই তাঁরা রাজ্য বা তৎকালীন সমাজের নিয়ন্ত্রক হলেন। উরুর অংশটি যদি উদর সম্পর্কিত হিসাবে গণ্য করা হয় তবে অন্ন চিন্তা ও অর্থ, (সে যুগে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বস্তু বিনিময় প্রথার মাধ্যমে অর্থ হিসাবে পরিগণিত হত) বিষয়ক কর্মে লিপ্ত হলেন বৈশ্যরা। আর উপরোক্ত তিন শ্রেণীর মানুষ বা বর্ণকে সচল রাখতে সাহায্য করতেন শূদ্ররা, অর্থাৎ পরিষেবাই ছিল তাঁদের পেশা।

বেদোক্ত সমাজ জীবনে মানুষ জাতির এই বর্ণ-বিভাজন প্রসঙ্গ বিশদে আলোচনার আগে বেদ-পূর্ব যুগে সমাজ ব্যবস্থা কি ছিল সেটা জানার চেষ্টা করা প্রাসঙ্গিক হবে।

সমাজবদ্ধ জীবে পরিণত হবার আগে কয়েক হাজার কোটি বছর আগে আমাদের এই পৃথিবীর সৃষ্টি।

হোমো স্যাপিয়েন্স বা মানুষের আবির্ভাবের ইতিহাস আমরা খুঁজে পেয়েছি প্রাচীনতম প্রস্তর যুগে, অর্থাৎ প্রায় আড়াই লক্ষ বছর আগে। চলেছিল প্রায় দু'লক্ষ বছর। এই যুগে মানুষ আগুন জ্বালাতে শেখে, পাথরের ফলক, জন্তুর হাড় ব্যবহার করত যন্ত্র বা হাতিয়ার হিসাবে। এরা ছিল যাযাবর সম্প্রদায়ের। ফলমূল, পশু পাখি, ঝিনুক ইত্যাদি সংগ্রহ করে খেতো। পশু-চর্ম ব্যবহার করত পোষাক হিসাবে।

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর আগে শক্তিশালী যে আদিম মানব পৃথিবীতে বাস করতো তাদের বলা হয় নিয়ানা-ডার্থাল। এদের দৈহিক গঠনে বানরকুলের আদিপুরুষের সাদৃশ্য ছিল।

তারও কয়েক হাজার বছর পরে অর্থাৎ পুরাতন প্রস্তর যুগে আরও উন্নত শ্রেণীর আদিম মানুষেরা এল। তারা তীরধনুক, বল্লমের ব্যবহার জানতো। পশুচারণ তাদের অজানা ছিল না। এদের গুহাচিত্র থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের কল্পনাশক্তির।

শেষ তুষার যুগের কয়েক শো বছর পরে মানুষকে চাষ-বাস করতে দেখা গিয়েছিল। দুধ সংগ্রহ ও কাপড় বোনার জ্ঞান যে তাদের ছিল সেটাও জানা যায়। খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে সিন্ধু উপত্যকায় তুলার চাষ হত।

নূতন প্রস্তর যুগে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৬ হাজার থেকে ৩ হাজার অব্দের মধ্যে লাঙ্গল চাষে পশুশক্তির প্রয়োগ এবং সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক ঘটনা চাকার ব্যবহার শুরু হয়ে গিয়েছিল। খৃষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগে সিন্ধু সভ্যতার অববাহিকায় চাকা-যুক্ত যানের ব্যবহার শুরু হয়ে যায়।

তারপর মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি বাড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমাজের পরিবর্তন ঘটতে লাগল দ্রুত গতিতে। মানুষ নিজের অজ্ঞাতেই শ্রম-বিভাজনের নীতিকে মেনে নিল। যারা চাষ করত তারা কৃষিকর্মকেই জীবিকা করে নিল। পশুপালকরা পশুর

পরিচর্যা করত। কেউ নৌকা, কেউ রথ, কেউ মাটির পাত্র, চাষের যন্ত্রপাতি তৈরীর কাজে বংশ বা গোষ্ঠীপর্যায়ে নিযুক্ত হতে থাকল। এই ভাবে শ্রমের শ্রেণী ভেদে বিভিন্ন কারিগর শ্রেণীর উদ্ভব হল।

প্রাকৃতিক ও বিশেষ করে জৈবিক নিয়মে বংশবৃদ্ধি হতে হতে মানুষের সংখ্যা ক্রমশঃ চললো বেড়ে। বুদ্ধিমান ও শক্তিশালীরা নেতৃত্ব নিয়ে সর্দার, গোষ্ঠীপতি বা আরও পরে ভূস্বামী বা রাজা হয়ে উঠল।

প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করতে না পেরে মানুষ বজ্র, বিদ্যুৎ, নদী, বায়ু, অগ্নিকে পূজা করতো। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে এক শ্রেণীর অতি বুদ্ধিমান মানুষ ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করা শুরু করল, এই ভাবে সৃষ্টি হল পুরোহিততন্ত্রের।

এইবার সমাজ আর কৃষকের বা গোষ্ঠীপতির সীমানার মধ্যে বিভক্ত হয়ে না থেকে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের রূপ নিল। সমাজে শ্রেণীভেদ দেখা দিল। প্রথম শ্রেণীভুক্ত হল রাজা ও তার পরিবার বর্গ, পুরোহিত, মসীজীবী ও রাজপুরুষ। পরের শ্রেণীর আওতায় পড়ল পেশাদার সৈন্য, কারিগর ও শ্রমিকরা। আর্য-সামাজিক স্তরের শেষ ভাগে ছিল কৃষকরা।

আর্যরা ভারতে আসার আগে সিন্ধু উপত্যকার হরপ্পা-মহেঞ্জদড়োতে যে উন্নত শ্রেণীর মানব-গোষ্ঠী বাস করত, কারুর মতে তারা হয় প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড (আদি-অস্ট্রেলিয়), নয় আদি আর্মিনীয় জাতির মানুষ ছিল।

খৃষ্টপূর্ব দু'হাজার শতাব্দীর পরে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে একাধিক জাতি বহুবার ভারত আক্রমণ করেছিল। গবেষকদের মতে ঋগ্বেদ বর্ণিত প্রাচীন আর্যজাতি ঐ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে ভারতে প্রবেশ করে সিন্ধু অঞ্চলের সভ্য মানুষদের যুদ্ধে পরাজিত করার পর ও দেশে বসবাস শুরু করে দেয়। বেদে উল্লেখিত যে জাতির সঙ্গে আর্যরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল তাদের

দস্যু বা দাস নামে বর্ণনা করা হয়েছে। আর্যরা এদের পরাজিত করে হীনকর্মে নিযুক্ত করতো, এবং সমগ্র মানব-সমাজ আর্য ও অনার্য এই দুই নামে পরিচিত হতে শুরু করে।

বর্তমান যুগে যে-জাতিভেদ আমরা দেখতে পাই, ঋগ্বেদের সময়ে ঠিক ঐ ধরনের জাতিভেদ প্রথা ছিল না। এখন যাদের শূদ্র বলা হয় সেই অনার্য বা দাস / দস্যুরা সে যুগে অতটা দলিত ছিল না। বহু ক্ষেত্রে আর্যরা তাদের সমীহ করত এবং ঈর্ষান্বিত ছিল। তৃতীয় মণ্ডলের ৫৩ সূক্তের ১৪নং ঋকে কাতর কণ্ঠে আর্যরা প্রার্থনা জানাচ্ছে, "হে মঘবন, নীচবংশীয়দের ধন আমাদের দাও।" ঐ মণ্ডলের ৩৪নং সূক্তের ৯নং ঋকে তারা বলছে অনেক কিছুর সঙ্গে ইন্দ্র দস্যুদের বধ করে আর্যবর্ণকে রক্ষা করেছেন।

বৈদিক সমাজে বর্ণাশ্রম প্রথা

বিশেষ কোনো ধর্মের প্রবর্তন ও প্রচার আক্ষরিক অর্থে না করলেও বেদ-ভিত্তিক ধর্মকে হিন্দুধর্ম আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। বর্ণ ও আশ্রমকে এই ধর্মের বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এই গ্রন্থের সূত্রপাতেই পুরুষ সূক্তের দশম মণ্ডলের ৯০ সূক্তে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উদ্ভবের কথা বলা হয়েছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১০২ নং সূক্তের ৩নং ঋকে আর্য ও দাসদের পৃথক রূপে বর্ণনা করা হয়েছে—তাতে বলা হচ্ছে যে, "হে ইন্দ্র, অনিষ্টকারী নিধনোদ্যত শত্রুদের উপর বজ্রাঘাত কর। দাস জাতীয় হোক বা আর্যজাতীয় হোক, ওকে অপ্রকাশরূপে বধ কর।"

যে অর্থে **Race**-কে জাতি বলা যায়, সেই অর্থে জাতি-ভিত্তিক বিভাজন হল আর্য ও দাসরূপে। পরে কালস্রোতে উন্নততর ও ক্ষমতাশালী আর্যরা দাসদের নিজেদের সমাজের অঙ্গীভূত করে

নিয়েছিল। তখন তাদের চিহ্নিত করা হল শূদ্র রূপে। অথর্ব বেদে দাস বলতে শূদ্রকে বোঝানো হয়েছে।

অবশ্য বৃত্তি ও পেশাকে ভিত্তি করেই যে মানুষের বর্ণগত বিন্যাস করা হয়েছিল তা সুস্পষ্ট। ব্রাহ্মণের কাজ ছিল ব্রহ্মবিদ্যা চর্চা করা ; ক্ষত্রিয়রা শক্তিবলে রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করত ; ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদির কাজে লিপ্ত থাকত বৈশ্যরা, এবং শূদ্ররা সেবা-কর্মের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল।

আমরা জেনেছি যে প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণরা যজন-যাজনকে পেশা হিসেবে নিয়েছিলেন। বিদ্যা-চর্চা ও বিদ্যাদানও ছিল তাঁদের জীবিকার অঙ্গ। ক্ষত্রিয়রা রাজা বা দেশের শাসক হতেন। অবশ্য ঋগ্বেদের কোনো কোনো জায়গায় 'ক্ষত্রিয়' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তবে প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে সে-সব ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় বলতে কোনো পৃথক জাতিকে বুঝায় না, বরং বলা যায় 'ক্ষত্রিয়' শব্দটি শক্তিশালী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ক্ষত্রিয়রা যে রাজা হতেন তার উল্লেখ আছে ঋগ্বেদে—"মম দ্বিতা রাষ্ট্রং ক্ষত্রিয়স্য….।" সে যুগে বণিক সম্প্রদায় যে ছিল তার প্রমাণ আছে একটি ঋকে, সেখানে বলা হয়েছে ইন্দ্র বণিকের ন্যায় ধন সংগ্রহ করতে যান।

তবে এই পেশাভিত্তিক বর্ণবিভাগ তখনও যে বংশানুক্রমিক হয় নি তার প্রমাণ আছে। নবম মণ্ডলের ১১৩ নং সূক্তে বলা হচ্ছে—সব মানুষের কাজ এক রকমের নয়, ভিন্ন ভিন্ন মানুষের কাজও ভিন্নতর। তক্ষ কাষ্ঠতক্ষণ করে, বৈদ্য রোগের প্রার্থনা করে ; একজন স্তোত্রকারের পুত্র চিকিৎসক আবার তার কন্যা যবচূর্ণ করে। এমন কি অসবর্ণ বিবাহ যে নিষিদ্ধ ছিল তার কোনো উল্লেখ নেই।

মনুষ্য জীবনে যে চতুরাশ্রমের কথা বলা আছে যথা ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং যতি বা সন্ন্যাস ; তা যে বিশেষভাবে পালন করা হত ঋগ্বেদে সে-কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে। অগস্ত্য মুনির শিষ্য ছিল এবং সে গুরু ও গুরুপত্নীর আলোচনায় যোগ

দিত, বা বরুণ অন্তেবাসী অর্থাৎ শিষ্যকে উপদেশ দিতেন এবং শিষ্যদের গুরুগৃহে বাস করতে হত—এ সব লিপিবদ্ধ আছে ঋগ্বেদে। অতএব ব্রহ্মচর্য আশ্রম যে ছিল একথা অনস্বীকার্য।

গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করতেন যুবকেরা ব্রহ্মচর্য আশ্রমে অবস্থান করে নিজেকে উপযুক্ত ভাবে গঠন করার পর। একটি ঋকে বংশগতিকে অব্যাহত রাখার কথা আছে। প্রার্থনা করা হচ্ছে যে প্রজাতন্ত্র যেন রক্ষা করা হয়, অর্থাৎ পুত্র পৌত্রাদিরূপ রজ্জু যেন কখনও ছিন্ন না হয়, এবং পিতার মত শক্তিমান পুত্র উৎপাদনের কামনাও করা হয়েছে সেখানে।

ঋগ্বেদে বাণপ্রস্থের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখিত না হলেও, বেদাঙ্গ অর্থাৎ উপনিষদের আরণ্যক অংশগুলিতে তার কথা আছে। পঞ্চশোদ্ধে বনং ব্রজেৎ—অর্থাৎ বয়স পঞ্চাশের অধিক হলে মানুষের উচিত বনবাসী হওয়া, অর্থাৎ সংসার বন্ধন ছিন্ন করে তপোবন জীবনকে বরণ করা।

সব কিছু বর্জন করে সন্ন্যাস ধর্মের মত ধর্ম আশ্রয় করে যতির জীবনযাপন করার কথা জড়িত আছে যতি আশ্রমের সঙ্গে। এক কথায় যাকে প্রব্রজ্যা বলা হয় ঋগ্বেদে এই শেষ আশ্রমের কথা আভাসিত না হলেও বৃহদারণ্যক উপনিষদে এর উল্লেখ আছে—যার একটি কাহিনী হল মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়ণীকে সম্পদ বণ্টন করে দিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য।

ঋগ্বেদের সময়-কালটি ছিল উন্নততর সংস্কৃতির ধারক-বাহক। কালপ্রবাহে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ক্ষত্রিয় বর্ণজাত বলে বাহুবলের পরিচয় দেওয়াটা রাজাদের অন্যতম ধর্ম ছিল। নিত্য-নতুন রাজ্য জয় করাটা তাঁদের কাছে ছিল গৌরবের বিষয়। আর শত্রু বধ করতে পারলে তো যশের সীমা থাকত না। সে-যুগের আর্য-সামাজিক ব্যবস্থা মূলতঃ কৃষিভিত্তিক থাকায় নদীর ধারে বসতি স্থাপন করাটা আর্যদের কাছে প্রয়োজনীয় ছিল। এদিকে ধীরে ধীরে বর্ণভেদ স্বীকৃতি লাভ করতে শুরু করেছে—ব্রাহ্মণ,

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। কিন্তু কার্য্যতঃ রাজ্য জুড়ে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত শ্রেণীর জাতি ছিল। আর্য ও অনার্য। ধনী অভিজাত, শাসকগোষ্ঠীরা আর্য এবং তাদের বাদ দিলে বাকী সবাই দাস বা অনার্য। সামাজিক ইতিহাস থেকে এটা জানা যায় যে আর্যদের আসার আগে যে-জন-গোষ্ঠী ভারতে ছিল তারাই দাস হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। বৃত্তি অনুসারে মানুষ বিভিন্ন জীবিকা অবলম্বন করে জীবনধারণ করত। কৃষক ছাড়াও তাঁতি, কুমোর, কামার, ভিস্তি এমন কি বারবণিতাও ছিল। গৃহপালিত পশুর ব্যবহার ছিল প্রচলিত। সোমলতার রস ছিল প্রধান পানীয়। কার্লমার্কস বর্ণিত হ্যাভ্স ও হ্যাভ নট্স অর্থাৎ ধনী ও দরিদ্র নিয়েই ছিল পূর্ণাঙ্গ সমাজ।

আর্যপূর্ব ভারতে যে বিশিষ্ট শ্রেণীর জাতি ছিল তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল অত্যন্ত উচ্চমানের। নগরভিত্তিক সভ্যতা গড়ে তুলেছিল তারা; হরপ্পা, মহেঞ্জোদরো তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এদের পরাজিত করে যে নেতৃস্থানীয় পুরুষপ্রবর আর্যদের এদেশের অধিপতি করেছিলেন, তাঁকে দেবত্বের আসন দিতে আর্যরা দ্বিধা করেনি। বৃত্রাসুরকে যে-রূপে আমরা পেয়েছি, তাতে তাঁকে অনার্য জাতির প্রতিনিধি ধরে নেওয়া যেতে পারে অনায়াসে। আর বৃত্রাসুরকে বধ করার ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়েছিলেন যে তেজস্বী শক্তিশালী পুরুষ, তিনিই ইন্দ্র। কালক্রমে ইন্দ্রকে দেবত্বের আসনে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এই ইন্দ্রের কৃতিত্ব অনেক। ইনি বহু দেশজ রাজাকে পরাস্ত করে বহু নগরকেন্দ্রিক রাজ্য জয় করেন। দাসবর্ণকে সমাজের নিকৃষ্ট স্থানে থাকতে বাধ্য করেন। বহু আর্যবর্ণকে রক্ষা করে-ছিলেন দস্যুদের নিহত করে। শম্বর নামের এক কৃষ্ণবর্ণ শত্রুকে বধ করেন ও সেইসঙ্গে বহু সহস্র কৃষ্ণবর্ণ শত্রুকেও। তবে দাস জাতির রাজাদের অস্তিত্ব যে তৎসত্ত্বেও টিকে ছিল তার উল্লেখ আছে দশম মণ্ডলের ৬২ নং সূক্তের ১০ নং ঋকে—সেখানে বলা হয়েছে

যদু ও তুর্বা নামের দুই দাস রাজা গাভীকুল পরিবৃত হয়ে ও মিষ্ট বাক্য বলতে বলতে মনুর ভোজনের আয়োজন করছেন।

জাতিভেদ ও অর্থনৈতিক অসাম্যজনিত শ্রেণীভেদ সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছিল যে যুক্তিতে তা অকাট্য বলে মনে করত সে যুগের মানুষ+যুক্তিটি এই—দুটি হাত সমান হলেও তাদের শক্তি সমান নয়, একই মাতার সন্তান দুটি গাভী সমান দুধ দেয় না, তাই গুণ ভেদে পার্থক্য থাকবে এবং তার ভিত্তিতে মানুষে মানুষে পার্থক্যও থাকবে।

এই ভাবে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ও বর্ণ গড়ে উঠল। আর ক্রমশঃ জাতি প্রথা শিকড় গেড়ে বসে পড়ল সমাজে।

ঋগ্বেদের আবির্ভাব কাল নিয়ে নানা মতপার্থক্য আছে। কেউ কেউ বলেন অন্ততঃ চার হাজার বছর আগে বেদ রচিত হয়েছিল। আবার ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে, বিশেষ করে ভাষার বিচারে আধুনিক কালের অনেক বিশেষজ্ঞ বেদের রচনাকাল খুব বেশি খৃষ্টপূর্বাব্দের হাজার বছর পর্যন্ত পিছোতে রাজী আছেন, তার বেশি নয়।

পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে মহাভারত রচয়িতা বেদব্যাস বেদগুলিকে চার খণ্ডে ভাগ করেছিলেন। অতএব বেদ মহাভারতের যুগের সমসাময়িক না হলেও, তারই কাছাকাছি সময়ে রচিত হয়।

এ নিয়ে বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে মহাভারতের অংশ বিশেষ শ্রীমদ্ভাগবত গীতাতেও কৃষ্ণ বলেছেন—গুণ ও কর্ম অনুসারে আমি চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ মানুষের বর্ণ নির্ধারিত হবে তার গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে। এর সমর্থনে জবালা ও সত্য-কামের কাহিনী উল্লেখযোগ্য। ভর্তৃহীনা জবালার কোলে জন্ম নিয়েও গুরুর আশীর্বাদে সত্যকাম দ্বিজোত্তম হয়েছিলেন একমাত্র সত্যকুলজাত হওয়ার যোগ্যতায়।

আধুনিক যুগ

বৈদিক সভ্যতা ক্রমশঃ কায়েমী হয়ে উঠল। ঘটে চলল নানা বিবর্তন। বেদোক্ত একেশ্বরবাদ কালক্রমে সংশোধিত ও সংবর্দ্ধিত হতে হতে লৌকিক দেবদেবীর সৃষ্টি হল। এক শ্যাম বহু হলেন। ধর্ম আচরণের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটল নানান আচার-বিচারের। ফলে মানুষে-মানুষে প্রভেদ বাড়তে লাগল। উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের পার্থক্য মেরুপ্রমাণ হওয়ার ফলে যারা গোষ্ঠীবদ্ধ ও স্বার্থের কারণে সুসংবদ্ধ তারা শক্তি প্রয়োগে অত্যাচার চালাতো জাত ও জাতিতে বিভক্ত দুর্বলতর জনগোষ্ঠীর উপর। অভিমান, ক্ষোভ একসময়ে পর্যবসিত হল ঘৃণায়, এবং সেটা নিউটনের গতি-শক্তির তৃতীয় সূত্রানুসারে উভয় সম্প্রদায়ের উপর বিপরীত ক্রিয়ায় প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল।

এই সময়ে আবির্ভাব হল জাতপাত নিরপেক্ষ ভগবান তথাগতের বৌদ্ধ ধর্ম। বৈদিক দেব-দেবীকে অস্বীকার করে নিরীশ্বরবাদের প্রচার চালালেন বুদ্ধদেব। যার মূলমন্ত্র অহিংসা ও সদাচার। এই নবধর্মের ধারা রাজশক্তির প্রভাবে দুকুল-ভাঙ্গা বন্যার মত ভারতকে প্লাবিত করল। আর অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে ব্রহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সংঘর্ষ প্রবল হয়ে উঠল, এবং রাজধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণরা তখন নীরবে মাথা নিচু করে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বৌদ্ধধর্মের জোয়ার থাকতে থাকতেই চলে এল জৈনধর্ম। ধর্মগুরুদের প্রভাবে সমাজের কাঠামোতে যে পরিবর্তন এসেছিল তা কিছু কালের জন্য সুস্থির হয়ে থাকার পর সেখানেও অবক্ষয় শুরু হল। এটা কালের ধর্ম, যুগের ধর্ম।

ঐ অবস্থা থেকে ভারতকে তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এলেন শংকরাচার্য। আবার বৈদিক ধর্মের শক্তি বৃদ্ধি হল। অবিভক্ত বঙ্গদেশে পাঁচশো বছর আগে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের অববাহিকা বেয়ে এল বৈষ্ণব ধর্ম। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠল সারা দেশ। এই প্রসঙ্গে ভাগবতের একটি কাহিনী উল্লেখ না করে থাকা যায় না।

একদিন দেখা গেল বৃন্দাবনের সীমান্তের অন্তর্বর্তী অঞ্চলে এক যুবতী বসে কাঁদছেন, তাঁর দুপাশে দুই বয়স্ক পুরুষ অচেতন হয়ে পড়ে আছে। নারদ এই দৃশ্য দেখে কৌতূহলবশতঃ সেখানে পেঁছে যুবতীকে তাঁর কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। যুবতী জানালেন যে তিনি তাঁর দুই পুত্রকে নিয়ে সুদূর কাঞ্চী থেকে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করে দ্বারকা, কাশী ইত্যাদি ঘুরে বৃন্দাবনে প্রবেশ করা মাত্র তাঁদের ঐ পরিবর্তন ঘটে গেছে। তাঁর দুই পুত্র অচেতন, এবং তাঁর নবকলেবর হয়েছে। বিস্মিত নারদ প্রশ্ন করলেন, আপনি যুবতী, কি করে আপনার এমন পূর্ণবয়স্ক সন্তান সম্ভব? যুবতী তা ব্যাখ্যা করতে পারলেন না। নারায়ণের কাছে প্রসঙ্গটি তোলা মাত্র উত্তর এল—ঐ পুত্রদ্বয় হল জ্ঞান ও বৈরাগ্য, তাদের মাতা প্রেমশক্তির প্রতীক। বৃন্দাবনের সংস্পর্শে আসা মাত্র জ্ঞান ও বৈরাগ্য হতচেতন, আর প্রেম তার স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। চৈতন্যদেব এই প্রেম-ভক্তিরই প্রচার চালালেন।

একটা বিচিত্র সত্য আমাদের ভাবিত করে যে বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, বা বৈষ্ণবধর্ম কোনোটিই ভারতে চিরস্থায়ী হয়ে সম্প্রসারিত হয় নি, বরং কোনো দেবকল্প মহাপুরুষের দ্বারা প্রচারিত ও সমর্থিত না হওয়া সত্ত্বেও প্রায় হাজার বছরের মুসলমান শাসন ও প্রায় দু'শো বছরের ইংরাজদের শাসনের প্রভাব এড়িয়েই সনাতন হিন্দুধর্ম আজও টিকে আছে। তার কারণ হয়ত একটাই—জনগণ মানসের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে যে ধর্মের অভ্যুদয় হয়েছে তা সহস্র ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে বেঁচে থাকার যোগ্যতা

অর্জন করেছে নিজের উদারতার গুণে।

সব ধর্মের একটা মূল সুর আছে, এবং তা হল পরমত সহিষ্ণুতা। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেছে ধর্মের ধ্বজাধারীরা 'স্বধর্মে নিধাং শ্রেয়ো, পরোধর্ম ভয়াবহ' এই শ্লোকের অপব্যাখ্যা করে ধর্মের নামা লাঠালাঠি, এবং ধর্মের বেদীতে বহু প্রাণকে বলি দিয়েছেন। নিজস্ব সর্বময় কর্তৃত্ব বজায় রাখতে মানুষের মধ্যে ভেদনীতির প্রয়োগ করে বিভাজন, উপবিভাজনে ক্ষতবিক্ষত করে রাখেন মানুষের সমাজকে। আর তারই ফলশ্রুতি জাতপাতের প্রচণ্ডতা। বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়েও আমরা প্রত্যক্ষ করছি জাতিত্বের অভিমান ও তার কুফলগুলিকে।

ভারতের জাতিপ্রথা

মহাদেশ বলতে যা বুঝায় আকারে অত বিশাল না হওয়া সত্ত্বেও ভারত মহাদেশের সমগ্র লক্ষণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। খণ্ডিত ভারতও পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে পরিচিত।

আগেই বলা হয়েছে যে আর্যদের আগমনের পর এ দেশে বর্ণ-বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠেছিল। আর্যরা মোটামুটি সুদর্শন ও শ্বেতকায় ছিলেন বলে অনুমান করা হচ্ছে, এবং দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় সভ্যতার জনগণ যে কৃষ্ণকায় হতেন এমন প্রমাণ এখনও বর্তমান। এটা ভৌগোলিক কারণেও হয়ে থাকতে পারে, আর্যরা শীতপ্রধান অঞ্চল থেকে এসেছিলেন ও গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের গ্রীষ্মাঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন ভারতের আদি অধিবাসীরা। উষ্ণতার তারতম্যে বর্ণ বিভেদ হওয়া সম্ভব। প্রচুর নিষ্ঠুর রক্ত-স্রোত বয়ে যাওয়ার পরও অদ্যবধি পৃথিবীতে শ্বেতকায় কৃষ্ণকায়দের

দ্বন্দ্ব বর্তমান।

আর্থ-সামাজিক কারণেও বর্ণবৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। বংশ-পরম্পরায় পেশাগত দক্ষতা অর্জনের পর সমাজের দৃষ্টিকোণে অপেক্ষাকৃত হীনকর্মে প্রবৃত্ত মানুষদের অন্ত্যজ করে রেখেছি আমরা।

কবিতায় প্রশস্তি গেয়ে বলা হয়েছে বটে—

"কে বলে তোমারে বন্ধু অস্পৃশ্য অশুচি
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমার পিছনে...."

কিন্তু তাই বলে বাড়ীতে যিনি মেথরের কাজ করেন তাঁকে সমপংক্তি-ভুক্ত করতে ক'জন রাজী আছেন সেটা ভেবে দেখার কথা।

ধোপা, নাপিত, চামার, মেথর ইত্যাদিদের সমাজবন্ধু বলে আপ্যায়িত করলেও বিবাহ দূরের কথা সামাজিক আদান-প্রদানে এখনও আমরা এঁদের দূরে সরিয়ে রেখেছি। অর্থাৎ জাত ও জাতির প্রভেদ বিদ্যমান আছে।

সংবিধানের অষ্টম তফসিলে যে-সব ভাষাকে ভারতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আর একটা চিত্র সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং সেটা এই যে দীর্ঘ যুগ ধরে ভারতে নানা জাতি বসবাস করে আসছে। কোল, ভীল, সাঁওতাল, নাগা, চাকমা, শবর প্রভৃতি মনুষ্য শ্রেণীর আদি বাসিন্দা, দাক্ষিণাত্যে তামিল, কন্নড়, তেলেগু, মালয়ালম ভাষীরাও অনুরূপ দাবীদার। এ ধারে রাজপুত, গুজরাটি, পাঞ্জাবীরাও নিজেদের ভাষার ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে বিভেদের সীমারেখা এঁকে রেখেছেন। এঁদের ধর্মও বিভিন্ন।

আর্যযুগে সংস্কৃতকে দেবভাষার মর্যাদা দিলেও, তখনকার নিম্ন শ্রেণীর অর্দ্ধ বা অশিক্ষিত মানুষের মুখের ভাষা অবশ্যই ছিল। এঁদের নিম্নবর্গদের জন্য ব্যবহৃত ভাষাকে প্রাকৃত বলা হত। প্রাকৃত জনের প্রাকৃত ভাষা।

জলবায়ু ও আবহাওয়ার জন্যে জীবনযাত্রায়, পোষাকে, খাদ্য-

ব্যবস্থায়, গৃহাদি নির্মাণে পার্থক্য দেখা দেওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। এর সঙ্গে আর্থিক অবস্থার তারতম্যের জন্যে বিভিন্ন শ্রেণীর দৈনন্দিন জীবনে প্রভেদ উৎকট হয়ে আত্মপ্রকাশ করত। প্রাচীন ঐতিহাসিক উপাদান থেকে আমরা জেনেছি যে উন্নততর মানুষেরা যজ্ঞ করতেন এবং সেখানে বলি দেওয়া পশুর মাংস খেতেন। দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ মৃত পশুর মাংস পেলে মহাভোজ লাগিয়ে দিতেন। ধনীরা পট্টবস্ত্র এবং গরীবরা নিম্নমানের কাপাস বস্ত্র, আরও দরিদ্ররা বল্কল ও পশুচর্ম ধারণ করতেন প্রায় বাধ্য হয়ে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে গাত্রবর্ণ, শিক্ষা, ধনসম্পদ, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, আবাসগৃহ, এবং সর্বোপরি কর্ম বা পেশার ভিত্তিতে জনগণের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল এবং তা যুগ পরম্পরায় বলবৎ থাকার ফলে ঐ ব্যবধানভিত্তিক বিভাজন জাত-পাতের সৃষ্টি করতে সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত সহায়ক বস্তুগুলি যাঁরা তৈরী করতেন তাঁরা বংশপরম্পরায় দক্ষতা অর্জনের ফলে এক বিশিষ্ট সম্প্রদায় হয়ে উঠলেন, এবং কালক্রমে তাঁরা ঐ নামে পরিচিত, এমন কি উপাধি অর্জন করে জাতের গোড়াপত্তন করে-ছিলেন। এখনও কর্মকার, সূত্রধর, রাজবংশী প্রভৃতি পদবীর প্রচলন দেখা যায়।

রাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর এই শ্রেণীবিন্যাস সুনির্দ্ধারিত হয়ে গেল। প্রথমে রাজা, তারপর কুশলীমন্ত্রী, বলশালী সেনাপতি, অমাত্যবর্গ, সভাসদ, পদস্থ রাজকর্মচারী ও যেহেতু তখন সবকিছুই ধর্মের নামে করা হত, যেমন রাজ্যাভিষেকে ব্রাহ্মণ পুরোহিত যাগ-যজ্ঞ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকর্মের পরিচালক হতেন, এবং তাঁর আশীর্বাদ ছাড়া এসব কিছুই সুষ্ঠুভাবে হতে পারত না; তাই ব্রাহ্মণদের এক বিশেষ ভূমিকা ও তজ্জনিত বিশেষ ক্ষমতা থাকত।

তারপর আসতো অধঃস্তন কর্মচারী, দৌবারিক, প্রহরী, দূত, গুপ্তচর, সৈনিক ইত্যাদিরা। অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ, পরিখা খনন,

দুর্গ নির্মাণ, পত্রবাহকদেরও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু এঁদের পরিচয় বেশির ভাগ সময়ে অখ্যাত, অজ্ঞাত থেকে যেতো।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠী, সওদাগর ইত্যাদিদের প্রতিষ্ঠা ভালমত ছিল, কারণ এঁরা প্রায়শই ধনী হতেন এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির সময়ে রাজকোষে অর্থের অকুলান হলে তা পূরণ করতেন।

সেবামূলক কর্ম যথা শিবিকা বহন করা, জল আনার জন্যে ভিস্তি, ক্ষৌরকর্মের জন্য নাপিত, বস্ত্র প্রক্ষালনে ধোপা, এমন কি মালিশ করার জন্যে অঙ্গ সংবাহক শ্রেণীরা নিজ নিজ পেশায় নিযুক্ত থেকে জীবিকা অর্জন করতেন, এবং ঐ ভাবে জাতের সৃষ্টি করে ফেলেন নিজেদের অজ্ঞাতসারেই।

বৈদেশিক আক্রমণের পর বিভিন্ন বিদেশীরা এদেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। স্বর্ণপ্রসু ভারত—এই কিম্বদন্তীর জন্যে বারবার ভারত আক্রান্ত হয়েছে বিদেশী লুণ্ঠক জাতিগুলির দ্বারা। শক, হূন, পাঠান, মোগোলরা ঐ কারণেই ভারত লুণ্ঠনে এসেছিল। আর দেখা যাচ্ছে যে সেই সময়ে বিভিন্ন রাজশক্তি বিভিন্ন কারণে, যার মধ্যে ধর্ম, সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য। পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে না থাকার দরুণ সহজেই বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেন নি।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। রাজপুত-মোগোল যুদ্ধের সময় এক সন্ধ্যায় মোগোল বাদশা দূরে অবস্থিত রাজপুত যুদ্ধ-শিবিরে শতশত উনুন জ্বলতে দেখে যখন কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে রাজপুত সৈন্যদের মধ্যে বিভিন্ন জাত আছে, যারা অন্যের তৈরী করা খাদ্য গ্রহণ করে না। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে সেই মোগোল বাদশা বলেছিলেন যে জাতের ব্যাপারে যারা এত স্পর্শকাতর যে সারাদিন যুদ্ধের পর বিশ্রাম না নিয়ে নিজেদের খাবার তৈরীতে ব্যস্ত তাদের পরাস্ত করা অত্যন্ত সহজ হবে। জাতি-ধর্মের কি নির্মম পরিহাস এই কাহিনী।

রাজানুগ্রহ পাবার লোভে ধর্মান্তরিত হওয়াটা এক সময়ে প্রবল হয়ে উঠেছিল। আর নিজেদের অস্তিত্ব সুদৃঢ় করার জন্যে জোর করে ধর্মান্তরিত করার ইতিহাসও আছে।

মুসলমান ও খৃষ্টানদের মধ্যে একটা বড় ব্যাপার ছিল— ধর্মাচরণের সময় অর্থাৎ মসজিদে বা গির্জায়, নমাজ পড়া বা গির্জায় প্রার্থনার সময় ঐ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকত না। এই ঐক্যবোধও তাদের প্রলোভিত করত যারা ভারতবাসী ও হিন্দু হয়েও শুধু নিচ জাতি বলে মন্দিরে প্রবেশাধিকার পেত না। এমন কি উচ্চবর্ণের জন্য সংরক্ষিত পুকুরের জলও স্পর্শ করতে দেওয়া হত না তাদের।

মহাভারতেও দেখতে পাই যে রাজকুমারদের অস্ত্র পরীক্ষার আসরে সারথির পুত্র হওয়ার সুবাদে মহাবীর কর্ণকে চরম অবমাননার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ক্ষত্রিয় না হওয়ায় একলব্যকে শিষ্যত্বে বরণ করেন নি গুরু দ্রোণাচার্য। বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিকার ভোগের বিষয়টিও জাতিভেদে ইন্ধন জুগিয়েছিল।

এ সব কিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছিল ধর্মীয় অনুশাসন। ব্রাহ্মণরা তাঁদের বিধান জারী করে বেশ কিছু পালনীয় আচার আচরণ বিধিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন, সেটা শ্রেণী-সোপানে যে যত নিচু স্থানে অবস্থান করত তার বেলায় তা ততই কঠোর হত। এবং বিধি-নিয়মগুলি পালন করতে করতে মানুষের মনে সে-সব এমন ভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে তারা নতুন বা ভিন্নতর কিছু স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারত না। যেমন উচ্চবর্ণের সামনে উচ্চস্থানে উপবেশন বা নগ্নপদে হাজির না হওয়াটা অপরাধ বলে মনে করা হত। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য সব জাতের অশৌচকাল ত্রিশ দিন ধরে চলত। বিদ্যা-শিক্ষা অর্জনের অধিকার শুধু অভিজাত সম্প্রদায়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত।

অনেক জাতের মানুষ ছিল অস্পৃশ্য অর্থাৎ তাদের স্পর্শ করা নিষিদ্ধ ছিল। অন্য এক শ্রেণীর অন্ত্যজ ছিল যাদের ছায়া পর্যন্ত

মাড়ানো চলত না। কিছুকাল আগে পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যের বেশ কিছু রাজ্যে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের বাধ্য করা হত গলায় কাঠের ঘণ্টা বেঁধে ঘুরতে, যাতে ঐ ঘণ্টার শব্দে উচ্চবর্ণের মানুষরা সাবধান হয়ে যেতেন পথ চলার ব্যাপারে।

মহারাষ্ট্রে পেশোয়ার পতনের মূলে ছিল এই ধরনের এক কুপ্রথা। মহারাষ্ট্রের মাহার সম্প্রদায় ছিল যোদ্ধা জাতি। এখনও ভারতীয় পদাতিক বাহিনীতে মাহার রেজিমেণ্ট আছে। পেশোয়া ঐ মাহারদের বাধ্য করেছিলেন গলায় নিজেদের পরিচয় চিহ্ন নিয়ে ঘুরতে, ফলে অপমানিত মাহাররা পেশোয়ার হয়ে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে, যখন কি পেশোয়ার সেনাবাহিনীর সিংহভাগে ছিল এই মাহার যোদ্ধারা। ফলে পেশোয়া রাজত্ব নির্মূল হয়ে যায়।

পাখি দীর্ঘকাল খাঁচায় আবদ্ধ থাকলে যেমন উড়তে ভুলে যায় বা উড়তে সাহস করে না, তেমনি সমাজের বিধি-নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ থ্যকতে থাকতে নিম্নবর্ণের মানুষ নিজেদের মনের স্বাধীনতাও ফেলেছিল হারিয়ে। ভীরুর মত মেনে নেওয়ার মধ্যে তারা পেত একধরনের আত্মতৃপ্তি।

ঈশ্বর-নির্ভর ব্যক্তিরা সাধারণতঃ ভাগ্যবাদী হয়ে ওঠেন। একটা প্রবাদ আছে জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। এ যেন অতর্ক, অপ্রশ্ন আত্মসমর্পণ। কর্মযোগী বিবেকানন্দ এই ধরনের ভীরুদের কঠোর সমালোচনা করে আত্মবলে বলীয়ান হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। অদৃষ্ট, বিধিলিপি, ললাট লিখন প্রভৃতি শব্দগুলির যথেচ্ছ ব্যবহারই প্রমাণ করে মানুষ তার অন্তর্নিহিত শক্তির সম্বন্ধে সচেতন নয়। যে দুঃখদুর্দশা ভোগ করতে হচ্ছে নিচ জাতিকে, যে অসম্মান তাদের অঙ্গের ভূষণ হয়ে উঠছে, তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ না জানিয়ে করুণ স্বরে তারা বিলাপ করেছে নিয়তি কেন বাধ্যতে। এবং ঐ ভাবে তাদের বোঝানোও হয়েছে।

আম্বেদকরের পূর্ববর্তীকালে জাত-পাতের সমস্যা

বেদ-উপনিষদে মানুষকে অমৃতের পুত্র বলে যত সম্মানই দেওয়া হোক না কেন, বাস্তব রূপটি ছিল ভিন্নতর। বেদে মানব সমাজকে যে আর্য-অনার্য রূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল তার কথা আগেই বলা হয়েছে। দুটি সুস্পষ্ট শ্রেণী ছিল, দাস বা নিচ জাতীয়দের মধ্যে উপ-বিভাজনের দাক্ষিণ্যে নিম্ন, নিম্নতর ও নিম্নতম শ্রেণীর মানুষও ছিল। এবং প্রভেদ সামান্যতম হলেও একে অপরের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠতর মনে করত; আর জীবন সংগ্রামের নীতি অনুসারে একে অপরের উপর অত্যাচারও চালাত। এমন কি কয়েক হাজার বছর আগে রোমক সভ্যতাতেও ভদ্রজনদের বলা হত সিটিজেন ও ভদ্রেতররা সবাই স্লেভস বা ক্রীতদাস। এই দাস প্রথা কিছুদিন আগে পর্যন্তও বলবৎ ছিল। আঙ্কল টমস কেবিন নামের সামাজিক দলিলভিত্তিক উপন্যাসে তার বিস্তারিত মর্মস্পর্শী কাহিনী লেখা আছে রক্তাক্ষরে। কথিত আছে সম্রাট নেপোলিয়ানের ভগিনীকে স্নান করাতো কয়েকজন কাফ্রী পুরুষ। এই নিয়ে গুঞ্জন যখন অভিযোগে রূপান্তরিত হয়েছিল তখন পলিন সরল মনেই বলেছিল—ওরা তো পুরুষ নয়, ওরা ক্রীতদাস। বাইবেলেও ক্রীতদাসদের কাহিনী আছে। ভারতেও বিজিত রাজ্যের বন্দীদের দাস করে রাখা হত।

প্রাচীন সব সমাজই ছিল ধর্মভিত্তিক, আর তাই ধর্মের দোহাই দিয়ে জাতের নামে বজ্জাতিও চলত বিনা বাধায়। অত্যাচারের সীমা ছিল বল্গা ছাড়া। নিপীড়িত মানুষ ভাগ্যের দোহাই দিয়ে নির্বিচারে সহ্য করত। কিন্তু সবকিছুরই তো একটা সীমা থাকে। আক্রান্ত হলে সামান্য পিঁপড়েও রুখে দাঁড়ায়। তাই সমাজে অবহেলিত নিম্নবর্গের মানুষ যখন অত্যাচারিত হচ্ছিল

তখন প্রত্যাঘাত যে আসবেই এটা নিশ্চিত ছিল। ইংল্যান্ডের কেণ্ট (Kent) অঞ্চলে চতুর্দশ শতকে এক কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল। তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যে বীর তাঁর নাম ওয়াট টাইলার—তাঁর রণধ্বনি ছিল—

হোয়েন অ্যাডাম ডাগ অ্যাণ্ড ইভ স্পান

হু ওয়াজ দেন দি জেণ্টেলম্যান—অর্থাৎ আদি পুরুষ অ্যাডাম যখন মাটি কোপাতেন আর ইভ কাপড় বুনতেন তখন কারা ছিল ভদ্রলোক। তিনি নিপীড়িত কৃষকদের বোঝাতে চেয়েছিলেন সবাই যদি সেই শ্রমিক দম্পতির সন্তান হয় তবে পরবর্তীকালে বড়লোক-ছোটলোকের প্রভেদ থাকবে কেন।

এরও বহুকাল আগে খৃষ্টপূর্ব ৭৩ সালে যে গ্রীক ক্রীতদাস মল্লযোদ্ধা ইতালীতে পলাতক ক্রীতদাসদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং দীর্ঘ দু'বছর তাদের নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যান রোমান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে, তাঁর নাম স্পার্টাকাস। শেষে অবশ্য বীরের মৃত্যু বরণ করেন এই পদদলিত মানুষের আমাদের জানিত প্রথম মুক্তি যোদ্ধা।

বিদেশের অনুরূপ কাহিনীতে সমাজের নিম্নবর্ণের মুক্তি সংগ্রামের আরও অনেক কাহিনী আছে। কিন্তু ভারতে ধর্মের প্রভাব এমনই বেশি ছিল যে নিছক নিচতলার সম্প্রদায়ের মুক্তিকল্পে সংগ্রাম করার কথা তেমন ভাবে ভাবার অবকাশ কেউ পেত না। রাজশক্তির বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রাম হয়েছে, তার মধ্যে প্রকৃত অর্থে গণমুক্তির সংগ্রাম হিসাবে চিহ্নিত করা যায় বীরসা মুণ্ডার সাঁওতাল বিদ্রোহ। সিধো-কানহু-এর কথা চিরস্মরণীয়। কিন্তু এগুলি তো কয়েক শো বছরের ইতিবৃত্ত মাত্র।

রামায়ণ-মহাভারতে উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের মানুষের

মিতালির উল্লেখ আছে—রামচন্দ্র গুহক চণ্ডাল, বা রাজা হরিশ্চন্দ্রের ডোম হওয়ার কাহিনীও আমরা জানি। কিন্তু এগুলি অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিসীমার মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল, একটা গোটা জাত বা সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে তেমন কোনো বৈপ্লবিক কাজ হয় নি মহাপ্রভু চৈতন্যের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত। ঈশ্বরের রাজত্বে সব মানুষই যে সমান—এ তত্ত্বের উদ্গাতা-পরিপোষক অবশ্যই শ্রীচৈতন্য। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সব হিন্দু যে-কোনো হিন্দু দেব-দেবীর মন্দিরে যাতে প্রবেশ করতে পারে তারই জন্যে সংগ্রামের ফলে শ্রীচৈতন্য যে বিপাকে পড়েছিলেন এমন সংকেতও কোনো কোনো ঐতিহাসিক-গবেষক আমাদের জানিয়েছেন।

পরবর্তীকালে রজকিনী প্রেমে মুগ্ধ কবি চণ্ডীদাসও বলেছেন,—'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' ধর্ম, বর্ণ, অর্থ, ক্ষমতা নির্বিশেষে মানবের শ্রেষ্ঠত্বের জয়গান গাইলেও তখনকার সমাজ জীবনের যে চিত্র তৎকালীন কাব্য সাহিত্যে আমরা দেখি সেখানে কিন্তু বর্ণ-বৈষম্য, জাতিভেদ প্রথা ও তার অনুষঙ্গী অত্যাচারের কথা বিস্তারে বর্ণিত আছে। কালকেতু—ফুল্লরার উপাখ্যানে ব্যাধেরা যে জনপদের বহিসীমায় বাস করত তার দৃষ্টান্ত আছে, যার কথা বৃহৎ পরাশর-স্মৃতিঃ গ্রন্থে নির্দেশনামা হিসাবে সন্নিবেশিত আছে—যথা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন উচ্চবর্ণ ছাড়া বাকীরা জনপদের বাহিরে বাস করিবে।

প্রাচীনকালে গুণ ও কর্ম অনুসারে বর্ণ বিভাগ করা হত ঠিকই, কিন্তু কিছুকাল অতিবাহিত হবার পর স্বার্থান্বেষী, ক্ষমতা-লিপ্সু অতি বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণরা কর্মভিত্তিক ভাবে না করে জন্ম-ভিত্তিকভাবে বর্ণের বিভাজন শুরু করলেন। পরিণতিতে বর্ণাশ্রম সমাজের গুণ ও কর্ম সমন্বিত শ্রম বিভাজন না করে করা হল শ্রমিক বিভাজন। আর এমন ভাবে তাদের বোঝানো হয়েছিল যে বংশগত পেশাতেই তার উন্নতি ও মোক্ষ। শেষ পর্যন্ত প্রায় জোর করেই পারিবারিক পেশার মধ্যে আবদ্ধ রাখা হত তাদের। কর্ম-

প্রবৃত্তি সম্বন্ধে কোনো স্বাধীনতা থাকত না। শিক্ষার অধিকার থেকে, অর্থনীতি ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার ব্যাপার থেকে এদের কৌশলে সরিয়ে রেখে নিচবর্ণের মানুষের সমাজের নিচের স্তরে বসবাস করার বিষয়টি ভাল ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল উচ্চবর্ণের মানুষ।

বেদ-উপনিষদ বাহিত যে ধর্মকে আমরা হিন্দুধর্ম নামে অভিহিত করে থাকি তাতে ঐ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সেই সব মহৎ, উন্নত, উদারতা প্রভৃতি গুণাবলীর সমাবেশ দেখা যায় পৃথিবীর অন্য সব ধর্মের মধ্যে, যেমন খৃষ্টান, ইসলাম, বৌদ্ধ, প্রভৃতিতেও যার উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণরা শক্তিশালী ক্ষত্রিয়দের সহযোগিতায় নিজেদের কায়েমী স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে স্মৃতি, সংহিতা, পুরাণ প্রভৃতি অর্বাচীন শাস্ত্র প্রণয়ন করে জাত-জাতি ব্যবস্থার ভিত্তিভূমি সুদৃঢ় করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাঁরা।

প্রত্যেক অণুর (atoum) মধ্যে যেমন তার প্রচণ্ড শক্তি সংহত থাকে, তেমনি মানুষের সমাজে অণু পরিমাণ মানুষের মধ্যেই দেখা যায় সদৃশ্য ক্ষত্রতেজ। সমাজে এক শ্রেণীর মানুষের উপর অকথ্য লাঞ্ছনার দৃশ্য দেখে কতজনের মন ক্রন্দসী হয়েছিল তার ইতিহাস আমাদের কাছে অজানা। তবে দু-একজন অসাধারণ মানুষ পর-দুঃখে কাতর হয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার যে হয়েছিলেন, আমাদের জানার পরিধির জন্যে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই শাস্ত্রজ্ঞ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সমাজ সংস্কারে ব্রতী হয়ে কিছু কর্মযজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষদের প্রতি তাঁর আচরণ কিম্বদন্তীর পর্যায়ে পড়ে। তবে তিনি সঠিক অর্থে অস্পৃশ্য সমাজের মুক্তির জন্যে বিশেষ কোনো সংগ্রাম করেন নি। বঙ্গে আধুনিকতার অগ্রদূত রাজা রামমোহনও জাত-পাতের লক্ষ্মণ-রেখাকে মানেন নি।

কর্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে প্রথম আমরা দৃপ্তকণ্ঠের

ঘোষণা শুনি মূর্খ, দরিদ্র, চণ্ডাল ভারতবাসীকে ভ্রাতৃ সম্বোধনে আদৃত করতে। তিনি চেয়েছিলেন জাত-পাতের বিভেদ ভুলে গিয়ে সবাইকে সমদৃষ্টিতে দেখে একে অপরের উন্নতিবিধানে সহায়ক হয়ে উঠুক অগণিত ভারতবাসী। সূক্ষ্ম ও পরোক্ষভাবে এর মধ্যে যে সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক বিচক্ষণতার ভাবটি বীজরূপে উপ্ত ছিল একথার সত্যতা প্রমাণ করার দায়িত্ব গবেষকদের। সমাজে সব শ্রেণীর মানুষের স্বাধীনতার ব্যাপারটির সঙ্গে রাজনৈতিক স্বাধীনতার যে এক বিশেষ ভূমিকা আছে এটা বিদিত সত্য। ঊনবিংশ শতকের শেষার্দ্ধ থেকে ভারতের বুকে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, লালা লাজপত রায়, ভাই পরমানন্দ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত, স্যার যদুনাথ সরকার, ঋষি অরবিন্দ, লালা হরদয়াল এবং সবশেষে বিতর্কিত রাজনৈতিক নেতা বীর সাভারকর প্রভৃতি মানব দরদীরা জাত-পাতের বিভাজন তুলে দেবার জন্যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

সিঁড়ির প্রথম ধাপ যেমন ধীরে ধীরে সর্বশেষ ধাপে মানুষকে পৌঁছে দিয়ে গৌরব বোধ করে, তেমনি এই সব দেশবরেণ্যদের কর্ম-প্রচেষ্টা সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে উন্নতি করে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দেবার কৃতিত্বটি অর্পণ করেন ডঃ আম্বেদকরকে।

দলিত সমাজ : মহাত্মা গান্ধী ও আম্বেদকর

পৃথিবীতে যদি বারোজন শ্রেষ্ঠ জননেতার নামোল্লেখ করতে হয়, তবে তার মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর নাম থাকতে বাধ্য। গুজরাটের বণিক সম্প্রদায়ের এই মানুষটি তখনকার দিনের সম্পন্ন পরিবারের সন্তানদের মত ইংল্যাণ্ডে গিয়ে ব্যারিস্টার বা আই. সি. এস হবার স্বপ্ন নিশ্চয়ই দেখেছিলেন। কিন্তু পেশায় যোগ দেবার পর তিনি

দেখতে পেয়েছিলেন যে পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্যে যে-সব বিশেষ গুণ প্রয়োজন তা তাঁর নেই। আইন সম্পর্কিত কর্ম নিয়ে তিনি যান দক্ষিণ আফ্রিকায়, এবং সেখানে যেহেতু তখনও শ্বেতকায়—অশ্বেতকায়দের মধ্যে সংগ্রাম চলছিল, তার নিষ্ঠুর শিকার হয়ে উঠলেন গান্ধীজি। যে আচরণ সেকালে ইংরাজরা ভারতীয়দের সঙ্গে করত, ভারতে বর্ণ-হিন্দুরা তার চেয়েও খারাপ ব্যবহার করতো স্বদেশের নিম্নবর্ণের সঙ্গে।

গান্ধীজী প্রমুখ সে সময়ের মুক্তিকামী জননায়কেরা দেশের কথা চিন্তা করতে শুরু করলেন। স্বাধীনতাকামী ছোট ছোট দল বাহুবলে দেশ স্বাধীন করার স্বপ্নও দেখতে লাগলেন। ইংরাজ শাসকরা বুঝতে পারল যে দেশে গণ-জাগরণ শুরু হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঝাঁসীর রাণী, তাঁতিয়া টোপিরা যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন রাজশক্তি নিয়ে, মঙ্গল পাণ্ডে তারই এক ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সংগ্রামী দলের মুখ্য অংশ। সেই বিদ্রোহের পরিবর্দ্ধিত রূপ হয়ে দেখা দিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, বালেশ্বরের যুদ্ধ, ভগৎ সিং, চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়, ক্ষুদিরাম প্রভৃতিদের সংগ্রাম। সন্দিগ্ধ ও শংকিত বৃটিশ সরকার এই সংগ্রামের অগ্নিবাহী স্রোতকে ভিন্ন মুখে শীতলক্ষেত্রের দিকে প্রবাহিত করানোর উদ্দেশ্যে হিউম সাহেবকে দিয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের গঠন করালো। চরমপন্থীদের নরমপন্থীতে রূপান্তরিত করার এক অপূর্ব ফন্দী। অপমানে, রোষে জর্জরিত ভারতবাসী এই কংগ্রেসের মাধ্যমে স্বপ্ন দেখতে লাগল স্বাধীনতার। উঠল স্বায়ত্তশাসনের দাবী।

ব্যারিস্টার মানুষ গান্ধী অত্যন্ত দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে নিজের দেশকে চেনার জন্যে শুরু করে দিলেন ভারত ভ্রমণ। অস্ত্র হিসাবে বেছে নিলেন অহিংসার শস্ত্র। সত্যাগ্রহ যার অংশ বিশেষ। গান্ধীজি আর একটা পরম সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন যে সমাজের মূল এককটি যখন ব্যক্তি, তাই পৃথক পৃথক ভাবে দেশের প্রতিটি মানুষ সদাচারের মাধ্যমে নিজ নিজ কর্তব্য যথারীতি

পালন করে তবে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে ঐক্যবন্ধ সমাজকে পরিশোধিত করে তুলতে সক্ষম হবে সহজেই।

আফ্রিকায় থাকাকালীন নিজেদের মলমূত্র নিজেরাই পরিষ্কার করে নেওয়ার নিয়ম নিয়ে সহধর্মিণী কস্তুরবার সঙ্গে তাঁর যে সংঘাত লেগেছিল এটাই বড় প্রমাণ। গান্ধী কোনো কর্মকেই হীন বলে মনে করতেন না। ডাঙ্গী বা মেথর সম্প্রদায়ের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে থাকা হীনমন্যতাকে সমূলে উৎপাটিত করার ব্যাপারে ঘটনাটি ঐতিহাসিক। গান্ধী নিজেই স্বীকার করেছিলেন অচ্ছুৎ সম্প্রদায়ের কথা তিনি স্বল্প বয়েস থেকেই চিন্তা করতেন। আর এটাও জানতেন যে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে ভারতের সব অধিবাসীদের মিলিত প্রয়াসকে জোরদার করতে হবে। তাই সমাজের নিম্নবর্ণকে রাজনৈতিক সংগ্রামের রণক্ষেত্রে অস্পৃশ্য দ্বিধায় দূরে সরিয়ে রাখাটা হবে চরম নির্বুদ্ধিতা। শুরু করে দিলেন হরিজন আন্দোলন। অতি নিম্ন জাতের মানুষদের তাদের জীবিকা অনুসারে আলাদা আলাদা নামে চিহ্নিত করে রাখলে তাদের মধ্যে একতা আসবে না। তাই সবাই পরমাত্মা হরির আশ্রিত প্রিয়জন বলে অভিহিত করলেন। ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের মহত্ত্বকে স্বীকৃতি দিলেও, কার্যক্ষেত্রে তিনি হরিজনদের টেনে উপর দিকে তোলার প্রয়াস চালিয়ে ছিলেন। অসাধারণ নাড়ী-জ্ঞান নিয়ে তিনি ভারতবাসীর হৃৎস্পন্দনের ভাষাটি ঠিকমতো বুঝে নিয়েছিলেন। তাই ধর্ম-পুরাণ সম্পর্কিত বর্ণভেদের বিষয়টিকে মেনে নিয়েছিলেন বর্ণহিন্দুদের সহায়তা ও সমর্থন লাভের জন্যে এবং অন্যদিকে নিম্নবর্ণের সঙ্গেও একটা আপোষ-মীমাংসায় তিনি আগ্রহী ছিলেন।

১৯৩০ সালের ১২ই নভেম্বর এবং ১৯৩১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের (লণ্ডনে অনুষ্ঠিত) ঘটনাবলী থেকে দুটি বিষয় জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সবচেয়ে বেশি—প্রথমটি হল—সেই প্রথম দলিত সমাজের

অবিসম্বাদিত নেতা ডঃ আম্বেদকরের আমন্ত্রণ, এবং দ্বিতীয়টি গান্ধীজীর স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা যে মাইনরিটিজ সাব কমিটির কার্যধারানুসারে ইতিমধ্যে স্বীকৃতি দেওয়া শিখ ও মুসলমান সম্প্রদায় ছাড়া আর কাউকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না, কারণ তাঁর সুচিন্তিত অভিমত হল দলিত বলতে সমগ্র যে সম্প্রদায়কে বোঝায় তারা হিন্দুদেরই অংশবিশেষ।

গান্ধীজীর বিশেষ আপত্তি ছিল দলিত শব্দটির ব্যাপারে। কোনো মানুষ বা সম্প্রদায়কে দলিত বলার অর্থই হল প্রত্যক্ষভাবে এক হৃদয়হীন নিষ্ঠুর প্রতিপক্ষের অস্তিত্বকে অঙ্গুলি চিহ্নিত করা। এটা সমাজকে নির্যাতিত ও নির্যাতনকারী এই দুই ভাগে ভাগ করে দেয়। যার একমাত্র পরিণতি হবে পরস্পরের মধ্যে বিভেদ বজায় রাখা ও সে কথা উভয় পক্ষকে অহরহ স্মরণ করিয়ে দেওয়া। সম্ভবতঃ গান্ধীজী জোলা সম্প্রদায়ের সাধক কবি কবীরের সেই বিখ্যাত দোঁহা—

জাত-পাঁত পুছে ন কোই,
হরকো ভজে সো হরকা হোই।

থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে সবাই হরির ভক্ত বা হরির আশ্রিত বলে নিম্নবর্ণের মানুষদের হরিজন আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন।

তবে গান্ধী ও তাঁর সহযোগী নেতৃবৃন্দের প্রধান বক্তব্য ছিল আগে ভারত রাজনৈতিক ক্ষমতা পাক, তারপর সামাজিক ভেদাভেদ প্রথা সম্বন্ধে সুদৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া যাবে। কিন্তু আম্বেদকর স্বশাসন সম্পর্কে পূর্ণ সমর্থন জানালেও অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন দলিত সমাজের সামাজিক মুক্তির বিষয়টিকে। এই নিয়ে দুই মহান নেতার মধ্যে মতদ্বৈধতা যে ছিল তা নানাভাবে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তৎকালীন ঘটনাবলীর মধ্যে।

১৯৩০-এর সময়ে ভারতের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ত্রিশ কোটি, এর মধ্যে এক পঞ্চমাংশ অর্থাৎ প্রায় ৬ কোটি মানুষ ছিলেন অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত। আর এদের সার্থক নেতা ছিলেন আম্বেদকর।

অস্পৃশ্য মাহার জাতে জন্মগ্রহণকারী এই নেতা বাল্যজীবন থেকে অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে করতে নিজস্ব প্রতিভাবলে শীর্ষস্থানে উঠেছিলেন। আশি বিষে দংশন করেছিল বলেই বিষের কি যাতনা সেটা তাঁর মত আর কেউ বুঝতে পারে নি। গান্ধীজীকেও চরম অপমান করা হয়েছিল, কিন্তু সেটা বিদেশে এবং শাসকগোষ্ঠীর বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের কাছ থেকে। কিন্তু আম্বেদকরের ক্ষেত্রে দৃশ্যপট ভিন্নতর। একই দেব-দেবীর পূজারী, একই দেশের অধিবাসী, ইংরাজ শাসনাধীনে সবাই শাসিত প্রজাকুল, কিন্তু তার মধ্যেও যখন দেশবাসীর হাতে অপমানিত হতে হয়, তখন তার বেদন-বোধ ভিন্নতর হতে বাধ্য, সে অপমানের জ্বালাও দ্বিগুণ দহন করে। তাই অস্পৃশ্য জাতদের সম্বন্ধে যে মমতা ছিল আম্বেদকরের তা গান্ধীজীর পক্ষে সম্ভব ছিল না ; প্রকৃত পিতা ও পালক পিতার মধ্যে পুত্রস্নেহের যে তারতম্য আম্বেদকর এবং গান্ধীজীর মধ্যেও ছিল সেই জাতীয় পার্থক্য। কৈশোরকালে আম্বেদকর ও তাঁর বড় ভাই আনন্দরাও একবার তাঁদের পিতার কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। পথে গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান তাঁদের অস্পৃশ্য জানা মাত্র গাড়ী থেকে নামিয়ে দেয়। কুশ্রী ভাষায় গালাগাল দেওয়া ছাড়াও তার গোমাতা দুটিও যে অস্পৃশ্যদের ছোঁয়ায় অপবিত্র হয়ে গেছে একথা জানাতে ভোলে নি। এর তুলনায় রেলের প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে গান্ধীজীকে জোর করে নামিয়ে দেওয়ার তিক্ততা যে ভিন্নমাত্রার ব্যাপার সেটা অবোধ্য নয়।

তাই আমরা দেখতে পাই যে অস্পৃশ্যদের হয়ে লড়াইয়ে আম্বেদকরের ভূমিকা গান্ধীজীর ভূমিকা থেকে ভিন্নতর। তবে এটাও ঠিক যে গান্ধীজীকে সব সময়ে স্মরণ রাখতে হয়েছিল সমগ্র ভারত ও সংখ্যাগরিষ্ঠদের মনোভাবকে, আর সে ক্ষেত্রে তুলাদণ্ডের ভারসাম্য বজায় রাখতে মহাত্মাজীকে অনেক সমঝোতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল। অন্যদিকে আম্বেদকর তাঁর ধ্যান-জ্ঞান

একনিষ্ঠের মত অর্পণ করেছিলেন দলিত সমাজের আত্মমুক্তির সংগ্রামে। একজন সর্বভারতীয় নেতার সঙ্গে, একজন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের দলনেতার যে পার্থক্য থাকা অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য গান্ধীজী ও আম্বেদকরের মধ্যে ছিল সেই পার্থক্য। অথচ দুজনেই নিজস্ব চরিত্র অনুযায়ী সৎ ও অবিচল থাকায় কিঞ্চিৎ সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

এই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তির আগে সেই আপ্তবাক্যটির আশ্রয় নেওয়া যাক। কথায় আছে—যার শেষ ভাল তার সব ভাল। যে আম্বেদকরকে কংগ্রেসের পয়লা নম্বরের শত্রু বলা হত, তাকেই পরবর্তীকালে আইনসভার মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করা হয় এবং ভারতের সার্বভৌমত্বরে গীতা হিসাবে চিহ্নিত ভারতের সংবিধান রচনা করার মূল দায়িত্ব দিতে একটুও দ্বিধা করেন নি নেহেরুদের মত শিক্ষিত বিদগ্ধ নেতারা। এই সম্মানের বিজয়কেতনই আম্বেদকর তথা দলিত সম্প্রদায়ের একছত্রাধিপতির সমাধির উপর লহর লহর লহরাঁয়ে—অর্থাৎ স্নিগ্ধ বায়ুবেগে হিল্লোলিত হয়েছে হচ্ছে এবং হতে থাকবে যতদিন না পর্যন্ত পূর্ণ রাহু মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করছেন তাঁর আশ্রিতরা।

সংবিধান ও আম্বেদকর

ভারতের অভ্যন্তরে বিপ্লবীগোষ্ঠীর সশস্ত্র সংগ্রাম, গান্ধীজীর অহিংস 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন এবং সর্বোপরি নেতাজীর 'চলো দিল্লী' অভিযানের দাপটে কম্পমান বৃটিশ সরকার ধূর্ত কূট-বুদ্ধির প্রয়োগ করে ভারত ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু যাবার আগে শেষ ছোবল মেরে গেল ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়ে।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের মধ্যরাতে ভারতের ভাগ্যাকাশে

স্বাধীনতা সূর্যের উদয় হয়। তার আগে ১৫ই জুলাই ১৯৪৭ সালে বৃটিশ পার্লামেণ্ট ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার আইন পাশ করে। ইতিপূর্বে গঠিত গণপরিষদ দ্বিখণ্ডিত হয়েও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিপতি হল।

গণপরিষদ ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের নেতৃত্বাধীনে গঠিত একটি কমিটি স্বাধীন ভারতের পতাকা কী হবে তাই নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করেছিল। ঐ কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন আম্বেদকর। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার আগে কিছু মারাঠা নেতা এবং বোম্বাইয়ের প্রাদেশিক হিন্দুসভা আম্বেদকরের কাছে তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধ পেশ করেন জাতীয় পতাকায় গেরুয়ার দাবীকে তুলে ধরতে। সেই সময়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পতাকায় গেরুয়া সাদা ও সবুজ রঙের মাঝে স্বয়ম্ভরতার প্রতীক চরকা চিহ্ন ছিল। গান্ধীজী চেয়েছিলেন জাতীয় পতাকাতেও চরকা থাক। সুপণ্ডিত আম্বেদকর ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের সর্বজন-শ্রদ্ধেয় সম্রাট অশোক প্রবর্তিত ধর্মচক্রকে ব্যবহার করার দাবীকে শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। এতে গান্ধীজী যে মর্মাহত হয়েছিলেন সে কথা বলাবাহুল্য মাত্র। চরকা কেটে স্বাধীনতা আনা যায় না—এই বলে অতীতে গান্ধীজীকে ব্যাঙ্গাত্মক সমালোচনা শুনতে যে হয় নি তা নয়, তবে গান্ধীজীর জীবন-দর্শন ও তাঁর সঠিক আত্মোপলব্ধির মর্ম অনেকেই ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। চরকা ছিল গান্ধীজীর কাছে স্বনির্ভরতার এবং কর্মযজ্ঞের প্রতীক মাত্র।

অনেক রক্তক্ষরণের মধ্যে দিয়ে বৃটিশদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে শেষ পর্যন্ত দেশ স্বাধীন হল। ১৯৪৭ সালের ২৯শে আগস্ট খসড়া সংবিধান রচনা কমিটি গঠন করল গণপরিষদ। এবং সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপারটি এই যে উক্ত কমিটির সভাপতি পদে নিযুক্ত হলেন বাবাসাহেব আম্বেদকর। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণস্বামী আয়ার; এন. ধাবরাও; স্যার বি. এন. রাও, যুগল

কিশোর খান্না, সৈয়দ সাদুল্লা এবং একমাত্র বঙ্গসন্তান এস. এন. মুখার্জী ইত্যাদি।

এর আগে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ঐকমত্যানুসারে মন্ত্রীমণ্ডলীতে আম্বেদকরকে নেওয়া স্থির হয়ে গিয়েছিল। নেহেরু ব্যক্তিগতভাবে নিজের কক্ষে ডেকে নিয়ে গিয়ে আম্বেদকরকে আইনমন্ত্রীর পদ গ্রহণের অনুরোধ জানালেন। এবং তাঁর কাছ থেকে সম্মতি পাওয়া মাত্র ডাঙ্গী কলোনিতে গিয়ে গান্ধীজীকে জানালেন সেই শুভ সংবাদ। বরফ ততক্ষণে গলে গেছে। দুই নেতা নিজেদের অতীত ভুলে গিয়ে ভারত গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

ভাগ্যের কি বিচিত্র পরিহাস—

মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলার মণ্ডনগড় নামের ছোট্ট শহর থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত অম্বাভাদে গ্রামের এক সাধারণ অস্পৃশ্য মাহার পরিবারের সন্তান, যাকে সামান্য গাড়োয়ান গাড়ী থেকে নামিয়ে দিয়েছিল, তৃষ্ণার জল চাওয়ায় পচা এঁদো ডোবার জল দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল, পুকুরের জল অপবিত্র করার জন্যে প্রচণ্ড মার খেতে হয়েছিল, পদস্থ আধিকারিক হয়েও নিজের আরদালী যাঁকে অপমান করেছিল, সম্মানিত পণ্ডিত অধ্যাপক হওয়া সত্ত্বেও যাঁকে বর্ণহিন্দু ছাত্রদের কাছ থেকে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু পেতে হয়নি, দলিত সমাজের মানুষ হওয়ার অপরাধে হোটেল থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন এবং আদর্শের সংগ্রামে বাধ্য হয়ে গান্ধী বিরোধী হওয়ার জন্যে যাঁকে কংগ্রেসের হিন্দু নেতারা দেশদ্রোহীর আখ্যা দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেনি, সেই আম্বেদকরকেই স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রীমণ্ডলীতে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং তার চেয়েও বিশেষ মর্যাদার কর্মভার বিনা দ্বিধায় সমর্পণ করা হয়েছিল ভারতের সংবিধানের খসড়া তৈরী করতে।

বিধাতা পুরুষ এই ঘটনায় কিন্তু অলক্ষ্যে হাসেন নি, কারণ তিনি জানতেন এটাই ছিল ভীম রাও আম্বেদকরের প্রারব্ধের ফল।

বুদ্ধদেব, মহাবীর, চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষদের পৃথিবীতে জন্ম নেওয়ার সঙ্গে যেমন অলৌকিক কাহিনী জড়িত আছে, আম্বেদকরের জন্মসূত্রেও তেমন এক কাহিনী সংযুক্ত আছে।

আম্বেদকরের নাম ছিল ভীম, পিতার নাম রামজী শকপাল। এই রামজীর এক পিতৃব্য অর্থাৎ ভীমের খুড়তুতো পিতামহ সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন। বহুকাল পরে একদল সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি এসেছিলেন মধ্যপ্রদেশের মোহাউ শহরে। সেই সময় সামরিক বিভাগে কর্মরত রামজী সপরিবার ঐ শহরে বাস করছিলেন। পরিবারের এক মহিলা ধোয়াধুয়ির কাজ সারবার জন্যে নদীর দিকে যাবার সময়ে পথিমধ্যে সন্ন্যাসীদের দলে রামজীর পিতৃব্যকে চিনতে পেরে ছুটে এসে বাড়ীতে খবর দেয়। রামজী সঙ্গে সঙ্গে ঐ সন্ন্যাসী কাকার কাছে গিয়ে তাঁকে বাড়ীতে আসার জন্যে অনুরোধ করেন, উদ্দেশ্য সন্ন্যাসীর পদধূলিতে তাঁর গৃহ ও পরিবারের সকলের কল্যাণ হবে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা গৃহাশ্রমে আসতে পারেন না, তাই ঐ সন্ন্যাসী পথ থেকেই বিদায় নেন, কিন্তু বিদায় নেবার আগে রামজীকে আশীর্বাদ করে বলে যান যে রামজীর গৃহে এক নবজাতকের আবির্ভাব হবে, যে পরবর্তীকালে ভারতের ইতিহাসে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে থাকবে। ১৮৯১ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখে ঐ আশীর্বাদের ফলস্বরূপ রামজী পেয়েছিলেন ভীমরাও রামজী আম্বেদকরকে।

অতএব আম্বেদকরের এই সম্মান নতুন কোনো এক ঘটনা নয়।

প্রচণ্ড পরিশ্রম করে খসড়া রচনা কমিটির সদস্যরা ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গণপরিষদের সভাপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের হাতে তুলে দিলেন তাঁদের শ্রমলব্ধ ফসল আম্বেদকরের মাধ্যমে।

পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী খসড়া সংবিধান সম্পর্কে জনমত নেওয়ার জন্যে দেশবাসীকে ৬ মাস সময় দেওয়া হল। মেয়াদ শেষ হবার পর ১৯৫৮ সালের ৪ঠা নভেম্বর গণপরিষদের সমক্ষে খসড়া সংবিধানটিকে বিধিবদ্ধভাবে গ্রহণ করার জন্যে পেশ করলেন ডঃ

আম্বেদকর। তারপর শুরু হল বিতর্কের পালা।

প্রথমেই খসড়া কমিটির সভাপতি হিসাবে ডঃ আম্বেদকর প্রাঞ্জল ভাষায় পেশ করলেন তাঁর বক্তব্য উপস্থিত সদস্যবৃন্দের সামনে।

মূল খসড়া সংবিধানে মোট ৩১৫টি অনুচ্ছেদ (article) এবং ৮টি তফসিল বা সংযোজিত তালিকা ছিল।

মূলতঃ ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, আয়ারল্যান্ড, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের শাসনব্যবস্থা ও সংবিধানগুলি সামনে রেখে ভারতের সংবিধান রচিত হয়েছিল।

সংবিধানের প্রথম দাবী ছিল জনপ্রতিনিধিত্বকারী এক দায়িত্বশীল সরকার গঠন, যার মন্ত্রীসভা সব সময়ে জনগণের প্রতিনিধি স্বরূপ সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যবৃন্দের কাছে নিজেদের কাজের জন্য দায়ী থাকতে বাধ্য হবে। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যবৃন্দের আস্থা হারালে মন্ত্রীসভাকে সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে দিয়ে শাসনভার ত্যাগ করতে হবে।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থার অনুরূপে ভারতে একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন, তিনিই হবেন দেশের প্রথম নাগরিক এবং রাষ্ট্রপ্রধান। অথচ শাসনক্ষমতার বাগডোর থাকবে না তাঁর হাতে। রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা হওয়া সত্ত্বেও দেশ-শাসনে তাঁর কোনো সক্রিয় ভূমিকা থাকবে না, অর্থাৎ তিনি শাসনভার অন্যদের দিয়ে বহন করাবেন।

সংবিধানে ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করলেও প্রকৃতঅর্থে প্রজাতন্ত্র বলতে যা বোঝায় তার মৌলিক চরিত্র এতে পরিস্ফুট হয়নি। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যগুলি অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে, এমন কি নিজেদের পৃথক সংবিধান রচনা করার ক্ষমতাও তাদের আছে। সাধারণ প্রশাসনের ব্যাপারে অঙ্গরাজ্যের ক্রিয়াকর্মে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে কেন্দ্রের হাতে সর্বাধিক ক্ষমতা তুলে দেওয়া

হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে এবং বিশেষ প্রয়োজনে কেন্দ্র যে কোনো সময়ে যে-কোনো অঙ্গরাজ্যের বিধানসভা ভেঙ্গে দিয়ে শাসনব্যবস্থা নিজের হাতে নিয়ে নিতে পারবে। শুধু কি তাই কর্মভার ও অধিক্ষেত্রের বিচারে কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত যে কোনো বিষয়ের সম্পর্কেও কেন্দ্র আইন পাশ করতে পারবে।

এই খসড়া সংবিধানের বৈশিষ্ট্য অনেক, তার মধ্যে অনেকগুলি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার প্রজ্ঞার ভিত্তিতে রচিত। ভবিষ্যতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যদি কোনো ধারা বা উপধারাকে বাতিল বা সংশোধন করার প্রয়োজন দেখা দেয় তবে তা সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের। এ ক্ষেত্রে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের মাধ্যমেই করা যাবে। এই সংবিধান একাধারে **rigid** ও **flexible** অর্থাৎ সুদৃঢ় এবং নমনীয়ও।

সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকারের কথা বিশদে লিপিবদ্ধ করা হল ভাগ ৩-এর ১২ থেকে ৩৫নং অনুচ্ছেদে। যার মধ্যে ১৯নং অনুচ্ছেদে দেশবাসীকে দেওয়া হয়েছে যে-সব অধিকার তা যে-কোনো স্বাধীন নাগরিকেরই কাম্য।

ভাগ ৪-এর ৩৬ থেকে ৫১ পর্যন্ত অনুচ্ছেদগুলি, যার শীর্ষক 'রাজ্যের কর্মপদ্ধতির নির্দেশক নীতিসমূহ', আম্বেদকরের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। মূল সংবিধানে যে সমাজতান্ত্রিক নীতিকে তিনি অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন, অথচ সমাজতন্ত্রের কথা কালির অক্ষরে লিপিবদ্ধ করাতে পারেন নি, তার কথাই বিধৃত আছে এই অনুচ্ছেদগুলিতে। মূল সংবিধানের প্রস্তাবনায় ছিল সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কথা, কিন্তু ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ২৪নং সংশোধনীর মাধ্যমে সেখানে সংযোজিত হয় 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দটি।

শাসকবর্গ ও শোষিতদের মধ্যে সম্পর্ক যে কখনো মধুর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না এই আশংকায় আম্বেদকর সমাজ-তান্ত্রিক অধিকারগুলিকে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিত্তবান শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জাতীয় কংগ্রেস দল তাতে বেশ আশংকিত হয়ে ওঠে, এবং ডঃ

আম্বেদকর ও কমিটির অন্যান্য সদস্যদের উপর পরোক্ষে চাপ দেওয়া হয় যাতে শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকারগুলিকে মৌলিক অধিকারের সঙ্গে যুক্ত করা না হয়। পরিবর্তে সেগুলিকে নির্দেশক নীতি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবী মেনে নেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করলে সরাসরি আদালতের আশ্রয় নেওয়া যায়, কিন্তু নির্দেশক নীতির ক্ষেত্রে অনুরূপ অধিকার দেওয়া হয়নি নাগরিকদের। তাছাড়া এই নির্দেশক নীতিগুলি বাধ্যতামূলক নয় ও অধিকারগুলির রূপায়ণ করা হবে কি হবে না, তা সম্পূর্ণ সরকারের ইচ্ছাধীন।

এই নির্দেশক নীতিগুলির বিষয়বস্তু হল জনকল্যাণ বর্ধনের জন্য রাজ্য কর্তৃক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন সম-ন্যায়বিচার এবং বিনা খরচে আইনগত সাহায্য দান, গ্রাম পঞ্চায়েত সংগঠন, কর্ম ও শিক্ষা প্রাপ্তির এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য প্রাপ্তির অধিকার, কর্মের ন্যায়সঙ্গত ও মানবোচিত শর্তাবলীর ও প্রসূতি সহায়তার বিধান, শ্রমিকদের জন্য জীবনধারনোপযোগী মজুরী ইত্যাদি, শিল্প-পরিচালন ব্যবস্থায় কর্মীগণের অংশ গ্রহণ, নাগরিকদের জন্য অভিন্ন দেওয়ানী সংহিতা, ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সব বালক বালিকার জন্য অবৈতনিক ও আবশ্যক শিক্ষার ব্যবস্থা, তফশিলী জাতি, তফসিলী জনজাতি ও অন্যান্য দুর্বলতর বিভাগের শিক্ষা বিষয়ক ও অর্থনীতিক স্বার্থের উন্নতিবিধান (অনুচ্ছেদ ৪৬), খাদ্যপুষ্টির ও জীবনধারণের মানের উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকরণ, কৃষি ও পশুশালার সংগঠন, পরিবেশরক্ষণ ও উন্নতি বিধান এবং বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ (৪৮ ক অনুচ্ছেদ), জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্মারক, স্থান ও বস্তুসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, নির্বাহিকবর্গ থেকে বিচারপতিবর্গের পৃথক্ করণ, এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করা।

এই অনুচ্ছেদগুলি খুঁটিয়ে পড়লে দেখা যাবে যে একটি

রাষ্ট্রের যতগুলি প্রয়োজনীয় দিক থাকা সম্ভব, তার প্রায় প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই সজাগ দৃষ্টি ছিল ডঃ আম্বেদকরের (যদিও ৪৮ ক অনুচ্ছেদটি (বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ইত্যাদি) ২৪তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সন্নিবেশিত হয় ১৯৭৬ সালে।

রীতি অনুযায়ী প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বা শেষ পাঠের পর সংবিধান গৃহীত হবার কথা ছিল সংসদ কর্তৃক। তাই নানা বিতর্কের পর চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৪৮ সালের ২৫শে নভেম্বর তারিখে ডঃ আম্বেদকর অত্যন্ত সততার সঙ্গে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে তিনি গণপরিষদে যোগ দিয়েছিলেন একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে এবং তা হল তফসিলী সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষিত করা। তারপর যখন তাঁকে খসড়া সংবিধান কমিটির চেয়ারম্যান করা হয় তখন তিনি প্রায় হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন, কারণ সারা দেশ তো বটেই সেই সঙ্গে তৎকালীন নেতৃবৃন্দও জানতেন দলিত সমাজের প্রতি আম্বেদকরের পক্ষপাতিত্বের কথা।

সংবিধান রচনা করতে বসে প্রথম থেকেই খুব সন্তর্পণে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছিলেন আম্বেদকর। মৌলিক অধিকারের ১৪নং অনুচ্ছেদে আইনের চক্ষে সকলের সমতার কথা মেনে নিয়েই পরের অনুচ্ছেদে বলা হল ধর্ম, প্রজাতি, জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের হেতুতে বিভেদ করা চলবে না।

সার্বজনিক ভোজনালয় বা হোটেলে প্রবেশাধিকার এবং জনসাধারণের ব্যবহারার্থে সমর্পিত কূপ, পুষ্করিণী, স্নানঘাট ইত্যাদি ব্যবহার করার অধিকারের কথা এতে সন্নিবেশিত হয়েছিল। মনে হয় ভোজনালয়, হোটেল এবং পুকুরের জল স্পর্শ করার জন্যে যে অপমান ও শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল আম্বেদকরকে এগুলি তারই প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি।

১৭ নং অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে অস্পৃশ্যতা দূর করতে গিয়ে ঘোষণা করা হল যে—" 'অস্পৃশ্যতা' বিলোপ করা হইল এবং যে-কোন প্রকারে উহার আচরণ নিষিদ্ধ হইল। 'অস্পৃশ্যতা' হইতে

উদ্ভূত কোন নির্যোগ্যতা বলবৎ রাখা বিধি অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে।"

এতদিনে আম্বেদকরের স্বপ্ন সফল হল। তাঁর আজীবন সংগ্রামের প্রথম সার্থকতম পুরস্কার এই ১৭ নং অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্তিকরণ।

২৯ এবং ৩০নং অনুচ্ছেদে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা আছে। নিজস্ব ভাষা, লিপি ও কৃষ্টির সংরক্ষণ, সরকারী বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অধিকার দেওয়া হল সংখ্যালঘুদের।

নির্দেশক নীতিসমূহের ৪৬ নং অনুচ্ছেদে নিজেদের দাবীকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন ডঃ আম্বেদকরে এই বলে যে, "রাজ্য, বিশেষ যত্ন সহকারে, জনগণের দুর্বলতর বিভাগের এবং বিশেষতঃ তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের, শিক্ষা বিষয়ক ও আর্থনীতিক স্বার্থের উন্নতিবিধান করিবেন এবং তাঁহাদিগকে সামাজিক অবিচার ও সর্বপ্রকার শোষণ হইতে রক্ষা করিবেন।"

১০ নং ভাগের ২৪৪ নং অনুচ্ছেদটি তফসিলী ও জনজাতি-ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কিত। তাতে বলা হয়েছে—"পঞ্চম তফসিলের খণ্ড 'ক' ও খণ্ড 'খ'-তে সন্নিবেশিত অসমরাজ্য ব্যতিরেকে অন্য যে-কোন রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ তফসিলী ক্ষেত্রসমূহের এবং তফসিলী জনজাতিসমূহের প্রশাসনে ও নিয়ন্ত্রণে প্রযোজ্য হবে পঞ্চম তফসিলের বিধানাবলী"। অসম রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল ষষ্ঠ তফসিলের বিধানাবলী।

১৬ নং ভাগের ৩৩০ থেকে ৩৪২ নং অনুচ্ছেদে কোন্ কোন্ শ্রেণী সম্বন্ধে বিশেষ বিধান সমূহ প্রযোজ্য হবে তার উল্লেখ আছে। ৩৩০ নং অনুচ্ছেদে নির্দেশিত হয়েছে লোকসভায় তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের আসন সংরক্ষণ করার কথা। ৩৩১ নং অনুচ্ছেদে রাজ্যসমূহের বিধানসভাগুলিতে তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের জন্য আসন সংরক্ষিত হবে লোকসভার পদ্ধতিতে মোট আসন সংখ্যার অনুপাতের অঙ্ক কষে। এই আসন সংরক্ষণ ও বিশেষ প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারকে আম্বেদকর মাত্র দশ বছর সময়সীমার মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিলেন। তাঁর আশা ছিল ঐ দশ বছরের মধ্যে দলিত বা তফসিলী সম্প্রদায়ের এমন উন্নতি হবে যে তারপর আর ঐ বিশেষ সুবিধা ভোগের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ না হওয়ার ফলে [illegible] সালের ৪৫ নং সংশোধনের মাধ্যমে সময়-সীমা ১০-এর পরিবর্তে ৪০ বছর করে দেওয়া হয়।

৩৩৫ নং অনুচ্ছেদে কেন্দ্রের বা রাজ্যের কার্যাবলী সংক্রান্ত কৃত্যক ও পদসমূহে নিয়োগে, প্রশাসনের কার্যকুশলতা রক্ষণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, তফসিলী জাতি ও তফসিলী জনজাতিসমূহের সদস্যগণের দাবী বিবেচনা করার কথা ঘোষিত হয়েছে।

৩৩৮ নং অনুচ্ছেদে তফসিলী জাতি, তফসিলী জনজাতিসমূহ ইত্যাদিদের ব্যাপারে যথারীতি কর্তব্য সঠিকভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তার তদারকির জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এক বিশেষ আধি-কারিকের নিযুক্তির বিষয়টি নির্ধারিত করা হয়েছে।

৩৩৯ নং অনুচ্ছেদটি তফসিলী ক্ষেত্রসমূহের প্রশাসন এবং তফসিলী জনজাতিসমূহের কল্যাণ বিষয়ক কাজকর্মগুলির উপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক।

৩৪০ নং অনুচ্ছেদে অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের অবস্থা জানবার ব্যাপারে তদন্ত-কমিশন নিয়োগ করার উল্লেখ আছে।

৩৪১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে কীভাবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি জারি করে যে-সব জাতি, প্রজাতি, বা জনজাতিসমূহ বা তাদের কোনো অংশ তফসিলী জাতিসমূহ বলে গণ্য হবে তাদের স্বীকৃতি দানের কথা।

৩৪২ নং ধারাটি জনজাতিসমূহের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি ৩৪১ নং ধারা অনুসারেই হবে।

২৪৪ (১) নং অনুচ্ছেদের সঙ্গে জড়িত পঞ্চম তফসিলটিতে তফসিলী ক্ষেত্রসমূহের ও তফসিলী জনজাতিসমূহের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধানাবলী সন্নিবেশিত হয়েছে।

পঞ্চম তফসিলের চারটি খণ্ডে তফসিলী সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার বিষয়টি ব্যাখ্যাত হয়েছে।

তফসিলী ক্ষেত্রসমূহের প্রশাসন ঠিকমত চলছে কিনা সে সম্পর্কে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক চাওয়া মাত্র প্রতিবেদন পেশ করবেন।

তফসিলী ক্ষেত্রসমূহ ও তফসিলী জাতিসমূহের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুযায়ী অনধিক কুড়িজন সদস্য নিয়ে একটি জনজাতি মন্ত্রনা পরিষদ গঠন করা হবে, ঐ পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নির্ধারিত করতে হবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের তফসিলী জনজাতিসমূহের প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে।

তফসিলী ক্ষেত্রসমূহে কেন্দ্র বা রাজ্যের কোন আইন প্রয়োগ করার এবং না করার ব্যাপারে রাজ্যপালকে ক্ষমতা প্রদত্ত হয়েছে ওখানে। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা আছে তফসিলী ক্ষেত্রের আয়তন বা সীমার পরিবর্তন বা সংশোধন করার। আর সবশেষে এই তফসিলের পরিবর্তন বা সংশোধনের ব্যবস্থাও করা আছে চতুর্থ খণ্ডে।

দলিত বা তফসিলী সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়ন এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের সুযোগ সুবিধা দানের জন্য সীমিত ক্ষেত্রের মধ্যে যতটা সম্ভব ব্যবস্থা করা যায় তা যে করা হয়েছিল উপরোক্ত আলোচনা ও উদ্ধৃতির মধ্যে সেটা সুস্পষ্ট।

বিতর্কের অবসানে আবেগমথিত কণ্ঠে ডঃ আম্বেদকর বলে-

ছিলেন—এই সংবিধানের দ্বারা আমরা শুধু দেশবাসীকে রাজ-নৈতিক গণতন্ত্রের অধিকার প্রদান করলাম, কিন্তু এটা সত্য যে অর্থনীতি ও সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হলে রাজনৈতিক অধিকার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। তাই দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন নিছক রাজনৈতিক গণতন্ত্র পেয়ে সন্তুষ্ট না থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এখন থেকেই যথেষ্ট হবার। ডঃ আম্বেদকর আরও বলেছিলেন যে—১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী আমরা পাবো রাজনীতির ক্ষেত্রে সমানাধিকার ও সমতা, কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য থেকেই যাবে। প্রথম সুযোগেই এই আপাতবিরোধিতার অবসান ঘটাতে হবে তা না হলে যারা এই বৈষম্যের শিকার হবে তারাই রাজনৈতিক গণতন্ত্রের কাঠামোটিকে ধ্বংস করে দেবে।

১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর খসড়া সংবিধানটি স্বাধীন ভারতের সংবিধানরূপে গৃহীত হয়। সভাপতির ভাষণে সভাপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ডঃ আম্বেদকরের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন যে ঈশ্বরের আশীর্বাদে যোগ্যতম ব্যক্তির হাতেই সংবিধান রচনা করার ভার অর্পিত হয়েছিল।

ভারতের বেশির ভাগ জনগণ আজও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধানকে মূলতঃ আম্বেদকরের একমাত্র কৃতিত্ব বলেই জানেন। কিন্তু না, পরবর্তী অধ্যায়ে দেখানো হবে ঐ সংগ্রামী মানুষটি এক বহুমুখী প্রতিভার অধিকারীও ছিলেন।

দলিত সমাজ ও আম্বেদকর

সংক্ষিপ্ত জীবনী

প্রথম পর্ব

১৮৯১ সালের ১৪ই এপ্রিলের এক পুণ্যলগ্নে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভীমরাও রামজী আম্বেদকর। পিতার নাম রামজী শকপাল, মাতা ভীমাবাই। শৈশবে তাঁকে সবাই ভীম নামে ডাকত। পিতা-মাতার ১৪টি সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন ভীম। এতগুলি সন্তানের মধ্যে শেষ পর্যন্ত মাত্র পাঁচটি সন্তান বেঁচে ছিল। এদের মধ্যে বয়ঃক্রম অনুযায়ী জ্যেষ্ঠপুত্র বলরাম ও আনন্দরাও, তারপর দুই কন্যা মঞ্জুলা ও তুলসী এবং কনিষ্ঠতম ভীমরাও।

অস্পৃশ্য মাহার বংশে জন্মগ্রহণ করলেও এদের পরিবার মোটামুটি ভাবে ছিল সম্পন্ন। ভীমের ঠাকুর্দা ছিলেন মালোজী শকপাল। তৎকালীন ব্যবস্থাপনায় এই মাহাররা যোদ্ধা জাতি হিসাবে পরিচিত ছিল, এবং এদের অনেকেই সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিত। মালোজী সামরিক বিভাগে চাকরী করতেন। তিনি তাঁর একমাত্র সন্তানকে ভালভাবে লেখাপড়া শেখান এবং রামজী নর্মাল স্কুল থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক হয়ে ওঠেন। ফলে সামরিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে উন্নীত হন এবং তখন তাঁর পদমর্যাদা ছিল সুবেদারের। দীর্ঘ ১৪ বছর তিনি প্রধান শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

সামরিক বিভাগে চাকরী করা সত্ত্বেও সনাতন হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। শিক্ষকতার শান্ত ও মার্জিত জীবন তাঁকে অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ হয়ে ওঠার পথে সহায়তা করেছিল। তিনি নিয়ম করে প্রতিদিন নিজের মতো

করে সকাল সন্ধ্যা পূজা-পাঠ করতেন এবং ধর্মীয় সঙ্গীত গাইতেন, পরিবারের অন্যান্য সদস্যের তাতে যোগদান করা ছিল আবশ্যিক। মাহারদের মধ্যে কদর্য অন্ন ভোজন, মৃত পশুর মাংস খাওয়ার সঙ্গে মদ্যপান ছিল এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অথচ রামজী শুধু মদ কেন, মাছ-মাংস পর্যন্ত খেতেন না। খেলাধূলাতেও ছিল প্রচণ্ড অনুরাগ। রক্তে শিক্ষকতার বোধটি সদা প্রবাহমান থাকায় সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষাগত জ্ঞান দানে সাহায্য করা ছাড়াও তাদের নৈতিক জীবন সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্যে নিয়মিত ভাবে তাদের রামায়ণ মহাভারত পড়ে শোনাতেন। ফলে বাল্যাবস্থা থেকেই এক সুগভীর ধর্মচেতনা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের তত্ত্বটি ভীমরাও-এর হৃদয়ে গেঁথে যায়। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের জয়ের কাহিনী।

সাধারণ মানুষ আত্মকেন্দ্রিক, সে শুধু তার নিজের ও নিজের পরিবারের সুখ-দুঃখের কথাই চিন্তা করে, কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম যে হয় না, তা নয়। আর যখন হয় তখনই হয় এমন মানুষের আবির্ভাব, যিনি পরিসর স্বল্প হলেও শ্রীকৃষ্ণের মত বলতে পারেন ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে—আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষটি মনুষ্য দেহে দলিত সম্প্রদায়ের কাছে ঈশ্বরের সমমর্যাদাই পেয়েছিলেন।

ভীমরাও-এর পিতা সুবেদার রামজী শকপাল মাহারদের উন্নতি-কল্পে সমাজ কল্যাণমূলক কাজেও ব্রতী হয়েছিলেন। সে যুগের প্রখ্যাত সংস্কারক মহাত্মা ফুলে ১৮৪৮ সালে অস্পৃশ্যদের জন্য ভারতে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন পুণা শহরে। তৎকালীন বঙ্গদেশে অনুরূপ কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন শশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, এরও অনেক পরে ১৮৮৩ সালে বরোদার রাজা শ্রী সয়াজীরাও গায়কোয়াড়ও অস্পৃশ্যদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন, যাঁর সাহায্য না পেলে সেদিনের ভীমরাও হয়ত ডঃ বি. আর. আম্বেদকর হয়ে

উঠতে পারতেন কি না সন্দেহ। এই মহাত্মা ফুলে ছিলেন রামজীর বন্ধু ও শ্রদ্ধাভাজন মহাপুরুষ। এঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রামজীও এমন কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যা তখনকার প্রেক্ষাপটে অবশ্যই ছিল দুঃসাহসিকতাপূর্ণ। ১৮৯২ সালে ভারত সরকার আদেশ জারী করে মাহারদের সামরিক বিভাগে যোগদান নিষিদ্ধ করে। সমাজসেবী নেতা রাণা ডেকে দিয়ে দরখাস্ত লিখিয়ে এর প্রতিবাদ করেন রামজী। অন্য ঘটনাটি—ঐ সময়ে অস্পৃশ্যদের উন্নয়নকল্পে প্রস্তাবিত ভবনের একটা অংশের দাবী জানান তিনি। সম্ভবতঃ নিজের জাতের জন্য বৃদ্ধ পিতার এই সংগ্রাম ভীমরাও-এর হৃদয়ে অনুরূপ কর্মে ব্রতী হবার বীজ বপন করেছিল।

ভীমরাও-এর মাতৃদেবী ছিলেন বোম্বাই প্রদেশের থানা জিলার অন্তর্গত মুরবাদ গ্রামের ধনী মুরবাদকর পরিবারের কন্যা। তাঁর পিতা ও পিতৃব্যরাও সামরিক বিভাগে উচ্চ পদাধিকারী ছিলেন। স্বামীর মত ভীমাবাইও ছিলেন ধর্মপ্রাণা মহিলা।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে ভীমরাও-এর পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়ই সম্পন্ন, শিক্ষিত ও সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সে যুগে দলিত সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই কবীর-পন্থী হয়ে উঠেছিলেন, কারণ ঐ মহাপুরুষ জাতপাতের ভেদ মানতেন না।

ভীমরাও-এর বয়স যখন দু'বছর, তখন রামজী চাকরী থেকে অবসর পেয়ে মধ্যপ্রদেশের সরকারী কোয়ার্টার ছেড়ে চলে আসেন কোঙ্কন জিলার দাপোলিতে। পাঁচ বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি হন ভীমরাও। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় এখান থেকেই। বোম্বাই শহরে সাতারাতে সামরিক বিভাগের কোয়ার্টারে চাকরী নিয়ে রামজী চলে আসেন সপরিবারে।

আর এই সাতারাতেই ঘটল সেই দুর্ঘটনা—ভীমরাও-এর দেবী প্রতিম মাতৃদেবী ভীমাবাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন—

ছিল যে অনেকে তাদের পৈতৃক বাসস্থানের নামানুসারে পদবী গ্রহণ করতেন। ভীমের পূর্বপুরুষের নিবাস ছিল আম্বাবাদ গ্রামে, তাই ভীম নিজের পদবী হিসাবে ব্যবহার করতেন আম্বাবাদেকর। ঐ শিক্ষক ভীমরাওকে এতই ভালবাসতেন যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্কুলের নথিপত্রে ভীমের পদবী বদলে নিজের পদবী অনুসারে আম্বেদকর করে দেন। এর ফল হয়েছিল সুদূর-প্রসারী—সাধারণ লোকে তাঁর ব্রাহ্মণোচিত পদবী দেখে তাঁর জাত সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলতে পারতেন না, এমন কি গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় গান্ধীজী পর্যন্ত ভুল করে আম্বেদকরকে উচ্চবর্ণের শিক্ষিত হিন্দু ভেবে বসেছিলেন। এই সুখ-স্মৃতি আম্বেদকর আজীবন গরলের মধ্যে অমৃতের স্বাদ হিসাবে গ্রহণ করতেন।

প্রথম দিকে স্কুল জীবনে অবহেলা পেতে পেতে পড়াশোনার দিকে খুব একটা আগ্রহী হয়ে ওঠেন নি ভীম। বাগান করা, এমন কি গরু চরানো বা ছাগল পোষার কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন।

১৯০১ সালের কিছু আগে পিতা দ্বিতীয় বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। বালক ভীম অন্য কোনো মহিলাকে মা হিসাবে মেনে নিতে মনের দিক থেকে গররাজী ছিলেন। সেটা যদি বা মেনে নিলেন, কিন্তু সৎমাকে তাঁর নিজের মায়ের গয়না পরতে দেখে ক্ষেপে উঠতেন। এর ফলে মনের দিক থেকে বিপর্যস্ত ভীম ঠিক করলেন পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে তিনি স্বাধীনভাবে নিজের জীবিকা অর্জন করবেন, পিতার গলগ্রহ হয়ে আর থাকবেন না। দিদিদের কাছ থেকে শুনেছিলেন সাতারার অনেক অল্প বয়সী ছেলে বোম্বাইয়ে কাপড়ের কলে চাকরী করে। অতএব তাঁকেও বোম্বাই যেতে হবে। কিন্তু সেখানে যেতে গেলে পয়সার দরকার। স্নেহশীলা পিসীমার কোমরে একটা পয়সার থলি সব সময়ে গোঁজা থাকত, সেখান থেকে পয়সা চুরি করা ঠিক করলেন। পরপর তিনবার চেষ্টা করার পর,

চতুর্থ বারে সফল হয়ে গেঁজের মধ্যে মাত্র আধআনা পয়সা দেখে হতাশ হলেন ভীম। তারপর মনে এলো অনুশোচনা, আর এই ঘটনাটা আমূল বদলে দিল ভীমরাও-এর জীবন, তিনি নতুন উদ্যমে পড়াশোনায় মন দিলেন, কারণ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার এটাই একমাত্র পথ। তাঁর শিক্ষকরা এই পরিবর্তন দেখার পর রামজীকে বললেন ছেলের পড়াশোনার ব্যাপারে মনোযোগ দিতে।

এরপর রামজী সপরিবারে চলে এলেন বোম্বাইতে। উঠলেন প্যারেলের এক বস্তি অঞ্চলে, যা দাবক চাওল নামে পরিচিত ছিল। এটা ছিল মূলতঃ শ্রমিক বস্তী, এখানে খারাপ লোকেরাও বাস করত।

ভীম ভর্তি হলেন মারাঠা হাইস্কুলে। লেখাপড়ায় বিশেষ করে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করার ব্যাপারে বিশেষ দক্ষতা দেখাতে লাগলেন তিনি।

এই সময় থেকে বালগঙ্গাধর তিলক এবং বীর সাভারকরের মত বই পড়ার নেশায় পাগল হয়ে উঠলেন। পিতৃদেবও এগিয়ে এলেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। দিদিরাও অর্থ সাহায্য করতেন। এর কয়েকমাস পরে ভীমরাওকে ভর্তি করা হল বোম্বাইয়ের বিখ্যাত স্কুল এলফিনস্টোন হাইস্কুলে। দ্রুত নিজের মেধার পরিচয় দিতে লাগলেন।

চাওলের একটি মাত্র ঘরে পুরো পরিবারকে থাকতে হতো আম্বেদকরদের। রামজী ছেলের পড়াশোনার সুবিধার জন্য তাঁকে মাঝরাতে জাগিয়ে দিতেন এবং লম্ফের আলোতে পড়তেন ভীমরাও।

ঐ সরকারী স্কুলেও জাতপাতের ভেদাভেদের শিকার হতে হয়েছিল ভীমরাওকে। একদিন এক শিক্ষক ভীমরাওকে ব্ল্যাক-বোর্ডে এসে কিছু লিখতে বলেছিলেন। বর্ণ হিন্দুর ছেলেরা তাদের জলখাবারের কৌটো ঐ ব্ল্যাকবোর্ডের পিছনে রাখতো।

পাছে ভীমের স্পর্শে সেগুলি অপবিত্র হয়ে যায় তাই ছাত্ররা ছুটে এসে টিফিনের কৌটোগুলি ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং চরম অপমানিত হয়ে বাড়ী ফেরেন ভীমরাও।

স্কুলে ভীমরাও ও তাঁর দাদাকে সংস্কৃত পড়ার অনুমতি দেওয়া হয় নি। বাধ্য করা হয় পারসী ভাষা পড়তে। কারণ সংস্কৃত নাকি উচ্চবর্ণের ভাষা।

এইভাবে বেশ কয়েক বছর কেটে যাবার পর ১৯০৭ সালে ভীমরাও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করলেন। মোট ৭৫০ নম্বরের মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন ২৮২। খুব ভাল একটা ফল না হলেও অস্পৃশ্যদের সমাজে এটা দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি করল। এক উৎসবের আয়োজনও করে ফেলল তারা। ঐ সভাতে বিখ্যাত সমাজসেবী এস. কে. বোলে এবং উইলসন হাইস্কুলের শিক্ষক কৃষ্ণাজী অর্জুন কেলুস্কর ভূয়সী প্রশংসা করলেন ভীমরাও-এর। এদিকে অর্থের অভাবে তাঁর দাদা পড়াশোনা ছেড়ে চাকরী করতে শুরু করেছেন। ভীমের আরও পড়াশোনা করার জন্যে সব রকম কষ্ট করতে পরিবারের সব সদস্যই রাজী।

সে যুগে বিশেষ করে নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে শিশু বিবাহের প্রচলন ছিল। অতএব ম্যাট্রিক পাশ ভীমের বিয়ের প্রসঙ্গ উঠবে এটা আর নতুন কথা কি। ভীমের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল, পাত্রীর নাম রামি। তাঁর স্বর্গত পিতা দাপোলিতে কুলীর কাজ করতেন, নাম ছিল ভিখু ওয়ালাঙ্গকর। দরিদ্র হলেও বেশ ভদ্র পরিবার। ভীমরাও-এর বয়স ১৭, পাত্রীর বয়স ৯। পরে রামির নাম বদলে করা হয় রমাবাই।

বাইকুল্লা বাজারে এক চালার তলায় বিয়ের আসর বসেছিল। চারপাশের পরিবেশ ছিল অত্যন্ত নোংরা।

স্বাস্থ্যের জন্য এক বছর নষ্ট হবার পর ভীমরাও আই. এ. পাশ করলেন। কিন্তু অর্থের অভাবে পড়াশোনা যখন বন্ধ হবার উপক্রম তখন ত্রাতারূপে এলেন কেলুস্কর। এই সময়ে টাউন হলের

এক সভায় বরোদার মহারাজা সয়াজীরাও গায়কোয়াড় ঘোষণা করেছিলেন অস্পৃশ্য সমাজের ছেলেদের লেখাপড়ার ব্যাপারে সাহায্য করবেন। কেলুস্করের মধ্যস্থতায় আম্বেদকর দেখা করলেন সয়াজীরাও-এর সঙ্গে এবং মাসিক ২৫ টাকার বৃত্তি অনুমোদন করলেন রাজা।

এলফিনস্টোন কলেজে আর এক দরদী অধ্যাপকের সংস্পর্শে এসেছিলেন ভীমরাও, তাঁর নাম অধ্যাপক মুলার। বই, জামা কাপড় দিয়েও তিনি সাহায্য করতেন। কিন্তু এখানেও অস্পৃশ্য হবার জন্য অপমান সহ্য করতে হয়েছিল ভীমরাওকে। কলেজের ক্যাণ্টিনের পরিচালক ছিলেন ব্রাহ্মণ, তিনি আম্বেদকরকে চা বা জল দিতে চাইতেন না। কিন্তু সব কিছু মুছে ফেলে একাগ্রচিত্তে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে লাগলেন ভীম। আগামী সংগ্রামী জীবনের প্রস্তুতিতে মগ্ন হয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করণীয় ছিল না তাঁর।

এর মধ্যে একটা ভাল ঘটনা ঘটল। রামজী বোম্বাইয়ের প্যারেলে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের তৈরী ১ নং চাওলে মুখোমুখি দুটি ঘর পেলেন তিনতলায়। এখানে পড়াশোনার ভাল পরিবেশ পেলেন ভীমরাও।

১৯১২ সালে বি. এ. পাশ করলেন আম্বেদকর। এই সময় নাগরিকদের প্রায় সব রকমের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে এবং দমন করে রাখার যে অপচেষ্টা বৃটিশ শাসকরা চালাচ্ছিল, তার ফলে রাজনৈতিক বিক্ষোভ ভয়ংকর আকার ধারণ করে। তিলককে মান্দালয় জেলে পাঠানো, সাভারকরের ভাইকে আন্দামানে নির্বাসিত করা ইত্যাদি কারণে যে বিপ্লবাত্মক কাজকর্ম শুরু হয়, তার ফলে বহু ভারতীয় যুবককে ফাঁসীতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। এই সব ঘটনা যুবক আম্বেদকরকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করে।

স্নাতক হবার পর চুক্তি মতো ভীমরাও বরোদা গেলেন রাজার অধীনে চাকরী করার জন্য। সয়াজীর সেনাবাহিনীতে লেফটেনাণ্টের

পদ পেলেনও। ১৯১৩ সালের জানুয়ারী মাসে মাত্র ১৫ দিন কাজ করার পর পিতার অসুস্থতার খবর পেয়ে বোম্বাই ফিরে এলেন। কিন্তু মুমূর্ষু পিতার সঙ্গে কোনো কথা হতে পারে নি, তবে মরণ পথযাত্রীর স্নেহস্পর্শটুকু শুধু পেয়েছিলেন ভীম। ১৯১৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী মারা গেলেন ভীমরাও আম্বেদকরের পিতা সুবেদার রামজী। বুকের মধ্যে অনেক অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্খার বোঝা নিয়ে, যা পরবর্তীকালে সন্তানের মধ্যে ফলবতী হলেও দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তিনি।

দ্বিতীয় পর্ব

বঞ্চিতের ও হতাশের দলের অঙ্গ হিসাবে বারবার লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করতে করতে কর্মজনোচিত এক তীব্র অহংকার মেশানো অভিমান পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল আম্বেদকরের হৃদয়ে। পিতার মৃত্যু তাঁকে নতুন করে ভাবতে শুরু করালো ভবিষ্যৎ কর্মপন্হা সম্বন্ধে। পিতার তথা বংশের মর্যাদা রাখতেই হবে।

ফিরে গিয়ে বরোদা রাজ্যে আর চাকরী করা নয়···কিন্তু কি করা যায় যখন ভাবছেন তখন ভাগ্যদেবী অতিমাত্রায় সুপ্রসন্না হলেন আম্বেদকরের ব্যাপারে। ১৯১৩ সালের জুন মাসে খবর পাওয়া গেল বরোদার মহারাজা কিছু কৃতী ছাত্রকে বিদেশে পাঠাচ্ছেন উচ্চশিক্ষার জন্য। ফিরে এসে দশ বছর বরোদা রাজ্যের হয়ে কাজ করবেন এই শর্তে তাঁকে ঐ রাজ্যের খরচে আমেরিকার কোলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান হল। এখানকার নতুন পরিবেশে তাঁর স্বাধীন সত্তা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতই স্বীকৃতি পাচ্ছে দেখে ভীষণ আনন্দ পান আম্বেদকর ····ঠিক এই রকম জীবনই তিনি চেয়েছেন সমগ্র অস্পৃশ্যদের জন্য।

বৃত্তির টাকা থেকে বাঁচিয়ে নিয়মিত বাড়ীতে পাঠাতেন আর নিজে বেশ কষ্ট করে থাকতেন বিদেশে। নেশা বলতে একটাই বই কেনা।

এখানে তিনি আর এক মহান শিক্ষককে খুঁজে পান, যাঁর কথা আম্বেদকর কোনোদিনও ভোলেন নি, তাঁর নাম অধ্যাপক এডউইন সেলিগম্যান। নানাভাবে সাহায্য ও উৎসাহ যোগাতেন তিনি তাঁর ছাত্রকে।

১৯১৫ সালে আম্বেদকর এম. এ. ডিগ্রী পেলেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল 'প্রাচীন ভারতে বাণিজ্যব্যবস্থা'। পরের বছর নৃতত্ত্ব সম্পর্কিত এক সেমিনারে ভারতে জাতি ব্যবস্থা সম্পর্কে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখে সুখ্যাতি অর্জন করেন।

ইংরাজীতে একটা কথা সাফল্যের চেয়ে বড় সাফল্য আর কিছু নেই, এবং এ কথা ঐ সময়ে আম্বেদকর সম্বন্ধে সর্বতোভাবে প্রযোজ্য হয়ে উঠেছিল। তিনি 'ভারতের জাতীয় লভ্যাংশ—ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা' বিষয়ে থিসীস লিখে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে কোলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. উপাধি পান।

আমেরিকায় থাকাকালীন জ্ঞানপিপাসু আম্বেদকর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ও তার চতুর্দশ সংশোধন, যাতে নিগ্রোদের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছিল—সম্বন্ধে গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন।

কোলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সাফল্য অর্জনের পর আম্বেদকর ইংল্যাণ্ডে গেলেন ১৯১৬ সালের মাঝামাঝি। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ তখনো শেষ হয়নি। লালা হরদয়ালের নেতৃত্বে গদর পার্টি আমেরিকায় অবস্থানকারী ভারতীয়দের উদ্বুদ্ধ করছিল 'ইংরেজ তাড়াও' আন্দোলন করার জন্য ভারতে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে। লালা লাজপত রায় তখন নিউইয়র্কে। তিনিও চেষ্টা করেছিলেন আম্বেদকরকে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে টেনে আনতে। কিন্তু তিনি

তখন শুধু নিজেকে তৈরী করতে ব্যস্ত। ১৯১৬ সালের শেষের দিকে একসঙ্গে গ্রেজইনে ভর্তি হলেন ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য এবং অর্থনীতি অধ্যয়নের জন্য লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স। লেখাপড়া যখন জোর কদমে এগোচ্ছে তখন বরোদার দেওয়ান জানালেন বৃত্তির মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে, আম্বেদকর যেন ফিরে আসেন ভারতে।

অধ্যাপকদের সাহায্যে শিক্ষাকালের সময় বাড়িয়ে নিয়ে আম্বেদকর ভারতে ফিরলেন ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে। তখন ভারতের ইংরাজ শাসকরা এক গভীর সংকটে আবর্তিত হচ্ছিল। ভারতে হোমরুলের দাবীতে অহিংস আন্দোলন এবং তার পাশাপাশি সহিংস বিপ্লব চলছে। চাপে পড়ে ভারত বিষয়ক মন্ত্রী মণ্টেগু ঘোষণা করলেন ভারতকে দায়িত্বশীল স্বায়ত্ত্ব শাসনভার দেবার ব্যাপারে চিন্তা করা হচ্ছে।

মণ্টেগু ভারতে এলেন, উদ্দেশ্য এখানকার বিভিন্ন দল, গোষ্ঠীদের সঙ্গে আলোচনা করা। অস্পৃশ্য নেতারাও সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু তখনও পর্যন্ত আম্বেদকর রাজনীতিতে আসেন নি।

মুচলেকার শর্ত অনুযায়ী এবার তো আম্বেদকরকে যেতে হলো বরোদা রাজ্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে। প্রথম থেকেই শুরু হল অপমান, মহারাজা বলা সত্ত্বেও একজন নিচজাতীয় এক মাহারকে অভ্যর্থনা জানাতে কেউই স্টেশনে গেল না। পরিচয় পেয়ে কোনো হোটেল তাঁকে আশ্রয় দিল না। শেষ পর্যন্ত পরিচয় গোপন রেখে একটি পার্সী সরাইখানায় আশ্রয় নিলেন, সঙ্গে দাদা।

মহারাজার ইচ্ছা ছিল তাঁকে বিত্ত মন্ত্রী করার, তবে তার আগে মহারাজের মিলিটারী সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করা ভাল। এখানে আর এক দফা অপমান ও অবজ্ঞা অপেক্ষা করছিল আম্বেদকরের জন্য। কর্মচারী ও পিওনরা তাঁকে কুষ্ঠরোগীর মত দূরে সরিয়ে রাখত। পিওনরা ফাইল কাগজপত্র তাঁর টেবিলে ছুঁড়ে দিত। খাবার জলও দিত না।

এতেও শান্তি নেই। জানতে পেরে গিয়ে একদল পার্সী লাঠি-সোঁটা নিয়ে সরাইখানায় চড়াও হল আম্বেদকরদের উপর। আট ঘণ্টার মধ্যে চলে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় সে যাত্রায় নিষ্কৃতি পান আম্বেদকর। মহারাজের কানে কথাটা উঠলো। তিনি দেওয়ানকে এর বিহিত করতে বললেন বটে, কিন্তু কোনো ফল হল না। আরও নানা ঘটনার পর ক্ষোভে দুঃখে বোম্বাই ফিরে এলেন আম্বেদকর।

এই সময় আম্বেদকরের সৎমায়ের মৃত্যু হল। দোর্দণ্ড প্রতাপের এই মুখরা মহিলার জন্য পরিবার থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও মায়ের যথারীতি শ্রাদ্ধ-শান্তি করলেন তিনি।

এদিকে আদিবাসী ও দলিত সমাজের গণচেতনা বাড়তে শুরু করেছিল। মাদ্রাজে 'পঞ্চম কলভি অভিভারতী অভিযান সঙ্ঘ' এবং 'মাদ্রাজ আদি দ্রাবিড় জনসঙ্ঘ' নামে সংগঠন শক্তিশালী হয়ে উঠছে। তাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ দলিত সমাজের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো শুরু করে দিলেন। কংগ্রেস মুসলীম-লীগ আঁতাত এক যৌথ প্রস্তাব দিল দলিত নেতাদের।

তাই নিয়ে বিচার-বিবেচনা করার জন্য ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে দলিতদের দুটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তার একটিতে কংগ্রেস-লীগের প্রস্তাবকে শর্তাধীনে সমর্থন করা হলো।

১৯১৮ সালের ২৩ ও ২৪শে মার্চ বোম্বাইতে প্রথম সর্বভারতীয় দলিত শ্রেণী সম্মেলনের অনুষ্ঠান এক ঐতিহাসিক ঘটনা। পৌরহিত্য করেন বরোদার মহারাজা সয়াজীরাও গায়কোয়াড়, যোগ দেন প্যাটেল, জয়কার, বিপিন চন্দ্র পাল। শুভেচ্ছা পাঠান রবীন্দ্রনাথ, দ্বারকায় শংকরাচার্য প্রভৃতিরা। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে তিলক দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন...অস্পৃশ্যতা একটি ব্যাধি, এবং তাকে নির্মূল করতেই হবে।

ব্যারিস্টার হবার বাসনাটা আবার জেগে উঠল তাঁর মধ্যে। কিন্তু অর্থের প্রয়োজন আছে। প্রাইভেট টিউশনিও শুরু করেছিল

বাধ্য হয়ে। খবর পেলেন বোম্বাইয়ের সিডেনহ্যাম কলেজে অধ্যাপকের পদ খালি হয়েছে। চাকরিটা তিনি পেলেনও, কিন্তু অস্পৃশ্য অধ্যাপকের কপালে প্রথম দিকে যথারীতি অপমানই জুটেছিল। কিন্তু সুদর্শন, দামী পোষাক পরা পণ্ডিত অধ্যাপকটি দেখতে দেখতে সব শ্রেণীর ছাত্রদের মন জয় করে ফেললেন। কিন্তু ওদিকে গুজরাটি অধ্যাপকরা আপত্তি জানালেন অধ্যাপকদের জন্য রাখা পাত্র থেকে আম্বেদকর জল খেতে পাবেন না।

অধ্যাপনার আড়ালে এইবার আম্বেদকর অস্পৃশ্য সমাজের জন্য প্রত্যক্ষভাবে কিছু করার উদ্দেশ্যে নানা যোগাযোগ শুরু করলেন। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে এগিয়ে এলেন আর একজন রাজা, কোলহাপুরের মহারাজা শ্রী সাহু মহারাজ। ইনি সবদিক দিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করতে শুরু করলেন অস্পৃশ্যদের, এমন কি তাদের সঙ্গে বসে খেতেনও।

তিলক প্রতিষ্ঠিত 'কেশরী' পত্রিকাতে আম্বেদকরের লেখা ছাপা হয় নি, অস্পৃশ্য শ্রেণীর লেখক হওয়ার ফলে। তাই নিজস্ব পত্রিকার অভাব বোধ করতে লাগলেন আম্বেদকর। ঐ মহারাজার আনুকূল্যে ১৯২৫ সালের ৩১শে জানুয়ারী অস্পৃশ্যদের নিজস্ব পত্রিকা 'মূক নায়ক' (বোবাদের নেতা) নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকার প্রকাশন শুরু হল। পিছন থেকে কলকাঠি নাড়তেন আম্বেদকর এবং জ্বালাময়ী সব প্রবন্ধ ছাপা হতে লাগল ঐ পত্রিকায়।

ক্রমশঃ দলিত সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে সভা-সম্মেলনের মাধ্যমে বিক্ষোভ প্রকাশিত হতে লাগল। এঁদের দাবী ছিল আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব যেন করতে দেওয়া হয় অস্পৃশ্যদের।

অধ্যাপনায় ভাল বেতন পেলেও জীবনযাত্রার মান কখনোই অকারণে বাড়ান নি আম্বেদকর। তখনও তিনি ঐ চাওলেই বাস করে চলেছেন। বেতনের একটা অংশ তুলে দিতেন শান্ত স্বভাবের গুণবতী স্ত্রী রমাবাইয়ের হাতে এবং তিনি নিঃশব্দে তাই দিয়ে

সংসার চালাতেন। আম্বেদকর আমেরিকায় থাকাকালীন প্রচুর অভাব অনটন থাকা সত্ত্বেও ঐ সাধ্বী রমণী কখনো মুখ ফুটে কাউকে কোনো অভিযোগ করেন নি কোনো ব্যাপারেই।

আম্বেদকর যখন আমেরিকা যান তখন স্ত্রী ছিলেন গর্ভবতী। একটি সন্তান জন্মায়। নাম রমেশ, সে কিন্তু শৈশবেই মারা গিয়েছিল। আমেরিকা থেকে ফেরার পর আম্বেদকরের আর একটি পুত্র হয়। নাম গঙ্গাধর, এরও অকাল মৃত্যু হয়েছিল। একমাত্র জীবিত সন্তান যশবন্তের স্বাস্থ্য ভাল থাকত না সব সময়ে। কিন্তু পারিবারিক কোনো সমস্যা যাতে স্বামীকে স্পর্শ না করে এ ব্যাপারে সদাসতর্ক থাকতেন এই মহীয়সী মহিলা।

বেতন থেকে অর্থ সঞ্চয় করে, কোলহাপুরের রাজার কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে ও বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার করে ১৯২০ সালের জুলাই মাসে আম্বেদকর ইংল্যাণ্ডে চলে গেলেন আইন ও অর্থনীতির অর্দ্ধসমাপ্ত অধ্যয়ন সমাপ্ত করতে।

এদিকে বরোদার মহারাজের অজ্ঞাতসারে রাজার প্রতিনিধিরা আম্বেদকরকে বিব্রত করা শুরু করলেন। চুক্তি ভঙ্গ করার দায় থাকায় বৃত্তির টাকাকে ঋণ হিসাবে গণ্য করে তা ফেরৎ পাবার জন্য আইনের আশ্রয় নেবার ধমকও তারা দিয়েছিল। শেষে মহারাজের কানে খবরটা পোঁছানোর পর এর অবসান ঘটে।

প্রচণ্ড সংগ্রাম করে, প্রায়ই অর্দ্ধভুক্ত থেকে কঠোর পরিশ্রম করে চললেন আম্বেদকর। পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি অস্পৃশ্যদের জন্য চিন্তাভাবনাও করতেন।

এদিকে ভারতের রাজনৈতিক পটভূমিতে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছিল। লোকমান্য তিলকের মৃত্যুর পর গান্ধীজীর নেতৃত্বে স্বরাজ আন্দোলন নতুন মোড় নিল। এসব কিন্তু ভাল চোখে নেন নি আম্বেদকর। উনি বুঝতে পারছিলেন একমাত্র বীর সাভারকরদের হিন্দু মহাসভাই অস্পৃশ্যদের পাশে এসে দাঁড়াবে।

ভারত সরকারের ১৯১৯ সালের আইন প্রথম স্বীকৃতি দিল

অনুন্নত শ্রেণীদের। প্রাদেশিক বিধান পরিষদে এদের প্রতিনিধিত্ব করার ব্যবস্থা হল।

ওদিকে লণ্ডনের পড়াশোনা যখন শেষ হয়ে আসার মুখে তখন আম্বেদকর চিন্তা করলেন জার্মানীর বিখ্যাত বন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার কথা। গিয়েছিলেন সেখানে কিন্তু লণ্ডন থেকে জরুরী তলব পেয়ে ফিরে আসেন, তাঁর থিসীস 'দ্য প্রবলেম অফ দ্য রুপী'-তে (টাকার সমস্যা) নাকি এমন কিছু কথা আছে যাতে বিপ্লবের গন্ধ আছে। অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাণ্ডিকও সে কথা সমর্থন করলেন। আম্বেদকরকে অনুরোধ করা হল আপত্তিকর অংশ বাদ দিয়ে নতুন করে থিসীস পেশ করতে। কিন্তু অর্থের অভাবে লণ্ডনে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। ফিরে এসে বোম্বাই থেকে সেই কাজ শেষ করে পাঠালেন লণ্ডনে। ১৯২৩ সালের মাঝামাঝি তাঁকে ডি. এস. সি. উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বিজয়ীর শিরোপা উঠল আম্বেদকরের মাথায়।

ক্রমশঃ তাঁর অধ্যয়ন অভিযান শেষ হল, যখন তিনি লণ্ডন থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করলেন, ডি. এস-সি হলেন, আমেরিকা থেকে পি, এইচ, ডি পেলেন, এবং বন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করলেন।

তৃতীয় পর্ব

অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানভাণ্ডার করায়ত্ত করে, স্বাধীন পেশায় যুক্ত হবার উপযুক্ত গুণ অর্জন করে, অর্থাৎ আইনজ্ঞ হয়ে তিনি নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সংসার সংগ্রামে। মূল লক্ষ্য কিন্তু অস্পৃশ্যদের মুক্তি।

তখনকার দিনে সাহেব জজের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা পাবার আশায় সাহেব ব্যারিস্টার নিযুক্ত করা পছন্দ করতেন মক্কেলরা এবং

সলিসিটাররা ব্যারিস্টার হলেও অস্পৃশ্য হবার জন্যে আম্বেদকরকে মামলা দিত না। ফলে প্রতিষ্ঠিত হবার ব্যাপারে বেশ অসুবিধার মধ্যে পড়লেন এই নতুন নায়ক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দুটি অবদান গেল আম্বেদকরদের অনুকূলে। বস্ত্রশিল্পের উন্নতির ফলে দলিত সমাজের মানুষের কর্মসংস্থানও হল, ফলে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি এবং গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শের প্রবাহের ফলে সমাজ-সংস্কার বিষয়ে মানুষ আগ্রহী হয়ে উঠল।

বোম্বাইয়ের বিধান পরিষদে অনুন্নত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব বাড়তি উৎসাহ যোগালো অস্পৃশ্যদের মধ্যে।

উচ্চবর্ণের ভাণ্ডারী পরিবারের শিক্ষিত সমাজসংস্কারক এস. কে. বোলে ১৯০৬ সাল থেকেই এই নিপীড়িত শ্রেণীদের জন্যে অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছিলেন। বোলের চেষ্টাতেই সাধারণ জলক্ষেত্র, কূপ, ধর্মশালা, সরকারী স্কুল, আদালত অফিস প্রভৃতি ব্যবহার করার সুপারিশ করা হল অস্পৃশ্যদের দাবী মেনে নিয়ে। আর একটি বিষয় এদের ভীষণভাবে আলোড়িত করেছিল, গান্ধীজীর মদতপুষ্ট ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলি ঘোষণা করলেন ভারতের অস্পৃশ্যদের ভাগ করে নেওয়া হোক হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে, এবং যারা মুসলমানদের ভাগে পড়বে তাদের ইসলামধর্মে দীক্ষিত করে নেওয়া হবে।

১৯২৪ সালে বারো বছর আন্দামানের জেলে থাকার পর বীর সাভারকর মুক্তি পেয়ে অন্তরীণ হলেন রত্নগিরিতে এবং স্বাস্থ্যের কারণে দুবছর জেলে থাকার পর গান্ধীজীও মুক্তি পেলেন। এই দুজন নেতাই উদ্যমী হলেন অনুন্নত শ্রেণীদের জন্যে কিছু করার উদ্দেশ্যে। ঐ বছরেই আম্বেদকরের সংগঠিত হল 'বহিষ্কৃত হিতকারিণী সভা', যে প্রতিষ্ঠানের কাজ ছিল অনুন্নত শ্রেণীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা। তবে গান্ধীজীর পন্থা ছিল সংস্কার সাধন করা। সাভারকর ও আম্বেদকর চাইছিলেন বৈপ্লবিক

পরিবর্তন। তবে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে ছিল সূক্ষ্ম পার্থক্য—গান্ধীজী চাইছিলেন বর্ণ হিন্দুদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাতে; সাভারকর আবেদন রেখেছিলেন তাদের বুদ্ধি ও বিবেকের কাছে, কিন্তু আম্বেদকরের আহ্বান একেবারে সরাসরি পৌঁছেছিল অনুন্নতদের হৃদয়ে। ফলে এরা আম্বেদকরের পতাকার তলায় সমবেত হতে লাগল।

ধীরে ধীরে আইন-ব্যবসায়ে আম্বেদকরের পশার বাড়ছিল। জনসংযোগও বাড়ছিল। কিন্তু তিনি তার ঐ চাওলের বাড়ী ছাড়েন নি। নানা ধরনের সরকারী পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছিলেন আম্বেদকর। কোনো ভাল কলেজে উচ্চপদে তাঁকে নেওয়া না হলেও ব্যাটলিয়ম অ্যাকাউণ্টে ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষকতা করতে লাগলেন। এই সময়ে স্ত্রী রমাবাই স্বামীকে উপহার দিলেন আর একটি পুত্র—রাজরত্ন, তার আগে ইন্দু নামে যে কন্যাসন্তান জন্মেছিল—সে অকালে পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়।

১৯২৬ সালে রাজরত্নের অকাল মৃত্যুতে ভীষণভাবে ভেঙ্গে পড়েছিলেন আম্বেদকর। সময়টা তাঁর ভাল যাচ্ছিল না। নিজের এই অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রায় যোগীদের মত জীবনযাপন করতে লাগলেন। বায়ু পরিবর্তনের জন্য স্ত্রী অন্যত্র থাকছিলেন, তাতেও তাঁর কোনো কষ্ট হয় নি। নিজেই সামান্য রান্না করে নিতেন।

১৯২৭ সাল নাগাদ বোম্বাইয়ের গভর্নর আম্বেদকরকে বোম্বাই আইন পরিষদে মনোনীত সদস্য করে নিলেন। অনুন্নত শ্রেণীর মানুষেরা এই ঘটনার মধ্য দিয়ে সামান্য আশার আলো দেখা শুরু করলেন।

এই সময় একটা ঐতিহাসিক ঘটনা আম্বেদকরের ভবিষ্যৎ সাফল্যের এক অন্যতম সিঁড়ি হয়ে উঠল।

১৯২৩ সালের বোলের প্রস্তাবটি কিছুটা সংশোধিত হয়ে ১৯২৬ সালে পাকাপাকি ভাবে অনুমোদিত হবার ফলে মাহাদ পৌরসভা

চৌদার পুকুরকে অস্পৃশ্যদের ব্যবহারের অনুমতি দিল। বর্ণহিন্দুরা কিন্তু বাহুবলে তাতে বাধা দিয়েছিল।

এর প্রতিবাদে প্রায় দশহাজার প্রতিনিধি নিয়ে মাহাদে এক বিরাট সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সেই সম্মেলনে কিছু বর্ণহিন্দুও যোগ দিয়েছিল। সভাপতির ভাষণে আম্বেদকর বলেছিলেন, নিজেদের মান-সম্মান যদি আমরা নিজেরা বজায় রাখতে না পারি তবে কেউই আমাদের মর্যাদা বা সম্মান দেবে না, উল্টে ঘৃণা করবে। অতএব আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে আর মৃত পশুর মাংস খাব না, অপরের বর্জিত উচ্ছিষ্ট খাদ্য স্পর্শ করব না, আর শ্মশানের জিনিষপত্র নেবো না। আর সেই সঙ্গে সন্তানদের শিক্ষিত করে তোলার শপথও নিতে হবে।

দ্বিতীয় দিনে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হল যে দলবেঁধে সবাই গিয়ে চৌদার পুকুরের জল নেবেন। শান্তিপূর্ণ মিছিল নিয়ে আম্বেদকর পুকুরে পৌঁছে যাবার আগে জল পান করলেন পুকুরের তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে।

প্রতিশোধ নেবার মানসে ঐ ঘটনার দু ঘণ্টা বাদে বর্ণহিন্দুরা রটিয়ে দিল যে এরপর অস্পৃশ্যরা যাচ্ছে বীরেশ্বর মন্দিরে ঢুকতে। অল্পক্ষণের মধ্যে মাহাদ শহর পরিণত হল এক রণক্ষেত্রে, যাতে নিরস্ত্র অস্পৃশ্যরা ভীষণভাবে মার খেল। যে পুকুরে মুসলমান, খৃষ্টানরা বিনা বাধায় জল নিতে পারে, সেখানে একই দেবতার ভক্ত হিসাবে অস্পৃশ্যরা প্রবেশাধিকার পাবে না—এমন বিচিত্র লীলা কি করে সম্ভব আম্বেদকর ভেবে পেতেন না। হামলা শেষ হবার অনেক পরে পুলিশ এল। সনাতনপন্থী হিন্দু হামলা রাজদের গ্রেপ্তার করাও হল; এবং বিচারে পাঁচজনের শাস্তি হওয়ায় অস্পৃশ্য সমাজ উৎফুল্ল হয়ে উঠল—তাদের মর্যাদা একেবারে ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে না তাহলে।

এই প্রসঙ্গে আম্বেদকর বলেছিলেন—পেশোয়াদের রাজত্বকালে এমন ঘটনা ঘটলে তাঁকে হাতীর পায়ের তলায় ফেলে পিষে মেরে

ফেলা হত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে পেশোয়াদের শাসনকালে অস্পৃশ্যরা নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সময়ে শহরের মধ্যে ঢুকতে পারত না, এবং নির্দিষ্ট সময়ে ঢুকলেও গলায় মাটির পাত্র ঝুলিয়ে ঢুকতে হত, যাতে সবাই তাদের অস্পৃশ্য বলে চিনতে পারে।

এরপর পরপর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাড়া জাগানো ঘটনা ঘটলো—বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব, সুরাট কংগ্রেসে তিলকের প্রতিবাদী ভূমিকা, সাভারকর কর্তৃক বিদেশী বস্ত্র পোড়ানো, ক্ষুদিরামের বোমা ছোঁড়া, ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর ডান্ডি অভিযান এবং শেষে নেতাজীর মুক্তিযুদ্ধ ১৯৪৩ সালে। কিন্তু সমাজের বুকে উচ্চ বর্ণের মানুষদের মনে তেমন বিশেষ কোনো পরিবর্তন এল না।

চৌদার পুকুরের জলে গোবর ইত্যাদি দিয়ে জলকে পবিত্র করা হল।

আবার অস্পৃশ্যদের মধ্যে বিক্ষোভ বাড়তে লাগল। নিজের বক্তব্যকে জনসমক্ষে ব্যাপকভাবে তুলে ধরার জন্য ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে 'বহিষ্কৃত ভারত' নামে একটি মারাঠী পাক্ষিক প্রকাশ করা শুরু করলেন। তীব্র ভাষায় আক্রমণ চলতে লাগল বর্ণহিন্দুদের আচরণের। এতে নতুন করে ইন্ধন জোগালো মাহার পৌরসভা কর্তৃক চৌদার পুকুরের জলে অস্পৃশ্যদের অধিকার দেওয়া প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেওয়ার ফলে। এর বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের প্রস্তাব নিলেন আম্বেদকররা। আদালতের আশ্রয় নিয়ে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে এল বর্ণহিন্দুরা। সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠতে লাগল।

নির্দ্ধারিত দিনে ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশবাহিনী নিয়ে হাজির হলেন। আইনজ্ঞ আম্বেদকর সমস্যার গুরুত্ব বুঝে সংঘর্ষ এড়িয়ে শুধু ঐ পুকুর প্রদক্ষিণ করে তখনকার মত ক্ষান্ত হলেন। কিন্তু রোষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল।

দীর্ঘ কয়েক বছর মামলা চলার পর চৌদার পুকুরের ব্যাপারে

অস্পৃশ্যদের জয় হয়।

আইন পরিষদের সদস্য হিসাবে আম্বেদকর মদ্যপান নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে জোরদার দাবী তোলেন। শিক্ষা ছাড়া যে নিচ বর্ণের মানুষদের মুক্তির অন্য কোনো পথ নেই—তার জন্য শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করার দাবীও তোলেন।

নিম্নবর্ণের মানুষরা যাতে সংগ্রামী মানুষের মত নিজেদের দাবীর জন্য সচেষ্ট হয় তার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, 'হৃৎ অধিকার ভিক্ষার মাধ্যমে ফিরে পাওয়া যায় না…অবিরাম সংগ্রামের প্রয়োজন তার জন্য।…নিরীহ ছাগলকেই সবাই বলি দেয়, সিংহকে নয়…।'

চতুর্থ পর্ব

চৌদার পুকুর আন্দোলনের ফলে অস্পৃশ্যদের জাতীয় নেতা হিসাবে সর্বভারতীয় স্বীকৃতি পেলেন আম্বেদকর।

১৯২৭ সালে ছত্রপতি শিবাজীর তিন শততম জন্মদিনের উৎসবে আম্বেদকরের আমন্ত্রণ ঐ জনপ্রিয়তারই প্রমাণ। ঐ বছরের জুন মাসে বোম্বাইয়ের ঠাকুরদার মন্দিরে তাঁদের প্রবেশের আমন্ত্রণ নিয়ে এক সংঘর্ষ হয়। তাতে হেনস্থা হন স্বয়ং আম্বেদকর।

ক্রমাগত অপমানিত হতে হতে অবশেষে তিনি দাবী জানালেন তাঁরা অর্থাৎ অস্পৃশ্য শ্রেণীরা হিন্দু, কি হিন্দু নয়, তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আশু প্রয়োজন। তিনি একথাও বলেছিলেন যে অস্পৃশ্যতাই অস্পৃশ্যদের সর্বনাশ করেছে, এবং শেষ পর্যন্ত হিন্দুদের ও জাতিরও সর্বনাশ করবে।

আম্বেদকরের আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি হতে শুরু করল। সমতা সঙ্ঘের সদস্যরা ব্রাহ্মণদের মতো পৈতে ধারণ করতে লাগল।

অস্পৃশ্যদের জন্য আলাদা মন্দির করার প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে আইনের দিক দিয়েও যে ব্যক্তি বিশেষের মন্দিরে

সবার সঙ্গে অস্পৃশ্যরাও প্রবেশ করতে পারে তা সপ্রমাণ করতে গিয়ে তিনি বলেন যে হিন্দুত্বে প্রশ্নে এ কথা কখনই ভোলা উচিত নয় যে রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকী আসলে একজন অস্পৃশ্য ছিলেন, ভক্ত রুইদাস প্রভৃতি মহাপুরুষদের সঙ্গে তুলনা করা যায় ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ, ক্ষত্রিয় কৃষ্ণ, বৈশ্য হর্ষ এবং শূদ্র তুকারামের।

মাহাদের ঘটনা যেমন সারা ভারতে অস্পৃশ্যদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল ঠিক তেমনি ভাবেই বর্ণাশ্রমের উদ্গাতা 'মনুস্মৃতি' পুড়িয়ে আম্বেদকর বর্ণহিন্দুদের রোষভাজন হয়েছিলেন।

এরপর নিম্নবর্ণের মানুষদের বিরুদ্ধে যে-সব আর্থ-সামাজিক প্রথার প্রচলন ছিল সেগুলির অবসানের জন্য সংগ্রাম শুরু করলেন আম্বেদকর। সামান্য জমি ('ওয়তন' নামে পরিচিত), এবং গ্রাম-বাসীদের দেওয়া খাদ্যশস্যের বিনিময়ে বংশপরম্পরায় ভৃত্য করে রাখাদের মুক্তির ব্যাপারটি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু শত চেষ্টা করেও এ সংক্রান্ত বিলটি তিনি আইন সভায় অনুমোদন করাতে পারেন নি।

ভারতের সমস্যাবলীর সমীক্ষা করার জন্য ১৯২৮ সালে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি বৃটিশ প্রতিনিধি দল ভারতে আসে, এর নেতৃত্বে সাইমন ছিলেন বলে এর নাম হয় 'সাইমন কমিশন'। এই কমিশনে কোনো ভারতীয় প্রতিনিধি না থাকায় কোনো রাজনৈতিক সংগঠনই এটাকে মানতে রাজী হয় নি, এমন কি জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 'ফিরে যাও সাইমন' স্লোগান দেওয়া হয় এবং কংগ্রেস এই কমিশনকে বয়কটও করে।

শুধু অস্পৃশ্যদের বাদ দিয়ে ভারতের প্রায় সব শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে কংগ্রেস এক অখিল ভারতীয় সম্মেলন আহ্বান করে। মতিলাল নেহরুর ওপর ভার দেওয়া হয় সংবিধান রচনা করার। তাতে অস্পৃশ্যদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণের কথা এড়িয়ে গিয়ে মনোনয়নের সাহায্যে তাদের প্রতিনিধিত্ব করার কথা বলা হয়। সাইমন কমিশন অবশ্য সব প্রদেশের আইন পরিষদের

সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে। সেই হিসাবে আম্বেদকর তাঁর বহিষ্কৃত হিতকারিণী সভার পক্ষ থেকে সংরক্ষিত আসনে যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা এবং বোম্বাই আইন সভার ১৪০টি আসনের জন্যে অস্পৃশ্যদের জন্য ২২টি আসন দাবী করেন।

কমিশনে পেশ করা তাঁর স্বতন্ত্র প্রতিবেদনে দেশের স্বার্থে বৃহত্তর কল্যাণ ও ঐক্য রক্ষার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সেই সঙ্গে মুসলিমদের জাতীয়তা বিরোধী দাবী-দাওয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। এর ফলে সমগ্র ভারতে তাঁর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—তিনি শুধু অস্পৃশ্যদের নেতা নন, প্রকৃত দেশভক্ত এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিকও বটে।

প্রায় দু'বছর পরে ১৯৩০ সালে সাইমন কমিশনের প্রতিবেদন পেশ হয়। তাতে হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের প্রস্তাব ছিল। অনুন্নত সমাজসহ হিন্দুদের মোট ৬০ শতাংশ আসন দেওয়া হয়েছিল। আর সবচেয়ে যেটা অপমানজনক প্রস্তাব ছিল—সেটা এই—নিম্নবর্ণের কেউ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইলে তাকে আগে গভর্নরের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে হবে। এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধীতা করে সাইমন কমিশনের প্রতিবেদনের সমালোচনা করতে গিয়ে আম্বেদকর বলেছিলেন—যেমন এক দেশের ওপর বিদেশী ক্ষমতার শাসনকে কোনো ভাবেই যুক্তিসম্মত বলে মেনে নেওয়া যায় না, ঠিক তেমনি কোনো এক জাতি বা বর্ণের উপর অন্য জাতির শাসনকেও মেনে নেওয়া যায় না। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রাদর্শে যখন ব্যক্তির মূল্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তখন রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য হবে অধীনস্থ প্রতিটি ব্যক্তির উন্নতি-বিধান করা। পরিশেষে দৃপ্তকণ্ঠে আম্বেদকর ঘোষণা করেন যে নির্যাতিত নিম্নবর্ণের মানুষেরা ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসনের পক্ষপাতী।

গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলন প্রসঙ্গে আম্বেদকরের বক্তব্য ছিল সুস্পষ্ট—ঐ আন্দোলন রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরে সহায়ক

হলেও, দলিত শ্রেণীর কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতার চেয়ে ঢের বেশি কাম্য সামাজিক বৈষম্য ও নির্যাতনের অবসান। সমাজবিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র হওয়ার সুবাদে তিনিই সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে তৎকালীন ভারতের পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সার্বিক সামাজিক উন্নতিও দরকার। তাঁর এই স্বচ্ছ ও বলদৃপ্ত দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য সাইমন-কমিশন ডঃ আম্বেদকরকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবার জন্য মনোনীত করেন দলিত শ্রেণীর মুখপাত্র হিসাবে।

সমাজ সচেতন আম্বেদকর একটা জিনিষ ভালভাবে বুঝেছিলেন দলিত সমাজের উন্নতির জন্য সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করতে হলে আগে তাদের প্রস্তুত করতে হবে ঐ দায়িত্বভার নেবার ব্যাপারে, এবং এর জন্য সর্বাগ্রে চাই এদের শিক্ষিত করে তোলা। সুশিক্ষা লাভ করলে জন্মগত ও বংশগত কুসংস্কার, কদভ্যাসগুলো ছাড়তে পারবে দলিতরা। তাই আম্বেদকর দলিতদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য পরিকল্পনা করতে শুরু করেন। আর তার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ১৯২৮ সালে গড়ে উঠল একটি সমিতি যার নাম 'ডিপ্রেস্‌ড ক্লাশেস এডুকেশন সোসাইটি' (অনুন্নত শ্রেণীদের জন্য শিক্ষা সমিতি)। উদ্দেশ্য ছিল নিম্নবর্ণের ছেলে-মেয়েরা যাতে বিনা খরচে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করতে পারে। সরকারী সাহায্যের জন্যে আবেদনও করেন আম্বেদকর। তখন সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন নিম্নবর্ণের সন্তানদের জন্য ৫টি হোস্টেল চালাবার পরিকল্পনা নিয়েছিল বোম্বাই সরকার। উপরোক্ত এডুকেশন সোসাইটির কাজকর্ম দেখে মুগ্ধ হয়ে সরকার সরকারী হোস্টেল-গুলিকে তুলে দেন ঐ সোসাইটির হাতে। সরকারী অর্থ সাহায্যের পরিমাণ পর্যাপ্ত না হওয়ায় আম্বেদকর জনগনের সাহায্য চান। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে যত সাহায্য পেয়ে-ছিলেন বর্ণহিন্দুদের কাছ থেকে ততটা পান নি।

সেই যুগে বর্ণহিন্দুদের পরিচালিত বিদ্যালয়ে অস্পৃশ্য

শ্রেণীর ছাত্রদের ভর্তি করা প্রায় হতোই না। বীর সাভারকর ও সিন্ধের সাহায্যে তীব্র আন্দোলন শুরু করে আম্বেদকর ঐ কুপ্রথা ভেঙ্গে ফেলতে অনেকটা সফল হন।

১৯২৯ সালে রত্নগিরি জেলার চিপলুনে এবং মধ্যপ্রদেশের জলগাঁওতে দলিতদের যে সম্মেলনগুলি হয়েছিল তাতে সক্রিয় অংশ নিয়ে আম্বেদকর বারবার নিজের সমাজের মানুষদের বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি এবং নিজেদের দাসত্ব মোচনে শিক্ষার ভূমিকাই বা কি। তবে এটাও বুঝিয়ে দিতেন যে শিক্ষিত হয়েও তিনি যখন বর্ণহিন্দুদের দ্বারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছেন, তখন শুধু শিক্ষালাভ নয়, নিজেদের আত্মমর্যাদা সম্বন্ধেও সচেতন হয়ে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে হবে অত্যাচারীদের কাছ থেকে। জলগাঁও-এর সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে অস্পৃশ্যদের ওপর চাপানো বিধিনিষেধগুলি যদি বর্ণহিন্দুরা তুলে না নেয় তবে তাদের অন্য কোনো পথ থাকবে না ধর্মান্তরিত হওয়া ছাড়া। কিন্তু এই সতর্ক-বাণীর তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া হয় নি উচ্চবর্ণের লোকেদের মনে।

১৯২৯ সালের জুন মাসে ডঃ সোলাঙ্কির প্রস্তাব অনুসারে নির্যাতিত শ্রেণী ও আদিবাসীদের সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত প্রকৃত অবস্থার স্বরূপ জানবার জন্য একটি কমিটি গঠন করে বোম্বাই সরকার। ঐ কমিটির অন্যতম সদস্য হিসাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার সময় ডঃ আম্বেদকরকে বেশ অপমানজনক অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

এক অভিভাবক লিখিত অভিযোগ জানান যে অস্পৃশ্য হওয়ার জন্য তাঁর ছেলেকে ক্লাশে ঢুকতে দেওয়া হয় না। বারান্দায় বসতে হয়। আম্বেদকর যখন ঐ ঘটনার তদন্তের জন্য স্কুলে যান তখন অস্পৃশ্য বলে তাঁকেও স্কুলে ঢুকতে দেন নি স্কুলের হেডমাষ্টার।

অন্যত্র এক সম্বর্ধনা সভায় আম্বেদকরকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা

করা হয়, কিন্তু কোনো টাঙ্গাওয়ালা অস্পৃশ্য আম্বেদকরকে তাদের টাঙ্গায় তুলতে রাজী হয় নি, কারণ তাঁর স্পর্শে ওদের টাঙ্গা অপবিত্র হয়ে যাবে। কিশোর বয়সে গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের মত এবারও টাঙ্গাওয়ালা শেষ পর্যন্ত আম্বেদকরকে টাঙ্গায় উঠতে দিল বটে, তবে সে নিজে টাঙ্গা চালাবে না। আম্বেদকরের এক উৎসাহী অনুগামী টাঙ্গা চালাবার দায়িত্ব নেন। কিন্তু অনভিজ্ঞ হওয়ায় টাঙ্গা উল্টে যায় এবং পড়ে গিয়ে আম্বেদকরের পা ভেঙ্গে যায়। ভাঙ্গা পা নিয়ে শয্যাশায়ী থাকা অবস্থাতেই নিজের প্রতিবেদন তৈরী করে ফেলেন আম্বেদকর। তাতে তিনি মুখোশ খুলে দেন পুরোহিত প্রথার দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের বিষয়টির। পণ্ডিত হোক বা মূর্খ, সব ব্রাহ্মণরা বংশপরম্পরায় কীভাবে সমাজকে প্রতারণা ও শোষণ করে চলেছে তার বিশদ বর্ণনা দেন আম্বেদকর। মূল প্রতিবেদনে বলা হয় যে, হিন্দুধর্মের সব আচার-নিয়ম নিষ্ঠা-ভরে পালন ও হিন্দু দেবদেবীদের ভক্তিভরে পূজা করা সত্ত্বেও নিম্নবর্ণের মানুষদের ঘৃণ্য ক্রীতদাসদের মত সমাজে একঘরে করে রাখা হচ্ছে ঐ ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের চক্রান্তে।

প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয় দলিত সমাজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সব রকম পড়াশোনার বাড়তি সুযোগ দেওয়া, তাদের বৃত্তির পরিমাণ বাড়ানো, এবং আরও হোস্টেল তৈরী করার। আর এই সব কাজ ঠিক মত করা হচ্ছে কিনা তার তদারকি করার জন্য একজন বিশেষ আধিকারিক নিয়োগেরও সুপারিশ করা হয়েছিল। চাকরীর ব্যাপারে বিশেষ করে সামরিক বিভাগ ও পুলিশে এদের জন্য ব্যবস্থা করা, পতিত জমি এই শ্রেণীর কৃষকদের দেবারও সুপারিশ করেছিল ঐ কমিটি।

পঞ্চম পর্ব

শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক আম্বেদকরের জীবনে আর এক নতুন স্রোত এল। রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে পড়তে শুরু করলেন তিনি।

আগেই বলা হয়েছে ত্রিশের দশকে স্বরাজ আন্দোলনের দাবী খুবই সোচ্চার হয়ে উঠছিল, সেই প্রবাহটিকে অন্যখাতে বইয়ে দেবার উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা, বৈঠক ইত্যাদির আয়োজন করে বৃটিশ রাজশক্তি সাময়িক ভাবে শিথিল বা প্রশমিত করতে চাইল ঐ সব আন্দোলনকে। গোলটেবিল বৈঠক তার প্রথম পদক্ষেপ।

তিনটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় লণ্ডনে। বৈঠকের সব সদস্যই বৃটিশ সরকার মনোনীত সদস্য।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বয়কট করা এই বৈঠকের প্রথম তারিখ ছিল ১২ই নভেম্বর ১৯৩০। মোট ৮৯ জন সদস্যের মধ্যে তিনটি বৃটিশ রাজনৈতিক দলের সদস্য ১৬ জন, ভারতের রাজন্য-বর্গের প্রতিনিধিত্বকারী ২০ জন, বাকী ৫৩ জন ছিলেন জাতীয় কংগ্রেস বাদে ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের ও গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। তেজবাহাদুর সপ্রু, জয়াকর, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, শীতলবাদ প্রভৃতি উদারপন্থী নেতা ছাড়া, মুসলিম নেতাদের মধ্যে ছিলেন, জিন্না, ফজলুল হক, শিখদের প্রতিনিধিত্ব করেন উজ্জ্বল সিং; হিন্দুমহাসভার পক্ষে গিয়েছিলেন ডঃ মুঞ্জে; বরোদা, ভূপাল, কাশ্মীর প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যের রাজাদের পক্ষে ছিলেন স্যার রামস্বামীরা ও দলিত সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে গিয়েছিলেন ডঃ আম্বেদকর ও রায়বাহাদুর শ্রীনিবাসন।

ভারতের বড়লাটের কাছ থেকে ঐ গোলটেবিল বৈঠকে

যোগদানের আমন্ত্রণ আম্বেদকর পাবার পর গোটা নিম্নবর্ণের মানুষ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন। সেই প্রথম মাতৃভূমির শাসন-পরিচালনার ব্যাপারে অনুন্নত শ্রেণীর মানুষ অংশগ্রহণ করতে চলেছেন। এই শ্রেণীর আত্মমুক্তির আন্দোলনে তাই এই ঘটনা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে আছে।

বৃটিশ জনমতকে নিজেদের অনুকূলে আনার জন্য প্রায় ৩ সপ্তাহ আগে লণ্ডনে পৌঁছে যান আম্বেদকর। লণ্ডনের প্রভাবশালী সংবাদপত্রগুলির সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে স্বদেশের নির্যাতিত শ্রেণীর জনগণের দুঃখ দুর্দশার কথা ও তাদের ওপর বর্ণহিন্দুদের বর্বর অত্যাচারের কাহিনীগুলি তুলে ধরালেন আম্বেদকর। ঐ সব করুণ কাহিনী প্রচারলাভ করায় বৈঠকের সকলেই ইংলণ্ডের জনমত নিম্নবর্ণের মানুষদের অনুকূলে চলে আসে।

১৯৩০ সালের ১২ই নভেম্বর থেকে বৈঠক চলে ১৯৩১ সালের ১৯শে জানুয়ারী পর্যন্ত। বৈঠকের উদ্বোধন করেন স্বয়ং সম্রাট পঞ্চম জর্জ এবং সভাপতি নির্বাচিত হন প্রধানমন্ত্রী র‍্যামাজে ম্যাকডোনাল্ড।

ভাবগম্ভীর পরিবেশে বৈঠক শুরু হয় এবং ভারতের বেশির ভাগ প্রতিনিধিই স্বায়ত্তশাসনমূলক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। কিছু মুসলিম নেতা দাবী জানান যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে অন্যান্য রাজ্যের সমান মর্যাদা দিতে হবে, সিন্ধু দেশকে পৃথক রাজ্য হিসাবে মেনে নিতে হবে।

বৈঠকে বেশীর ভাগ বক্তাই অত্যন্ত জোরালো ভাষায় সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ করেন, তবে বাগ্মীতার অসাধারণত্বে সবচেয়ে বেশি প্রশংসা আদায় করেন ডঃ আম্বেদকর।

ভারতের জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশের প্রতিনিধি হিসাবে অনুন্নত শ্রেণীদের ঘৃণ্য জীবনের কথা বিস্তারিত বর্ণনা করে তিনি দেখান যে বৃটিশ শাসনের আগে বা পরে এই শ্রেণীর মানুষদের অবস্থার

কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। কোনো ব্যাপারেই বৃটিশ সরকার অনুন্নত শ্রেণীদের উন্নতিসাধক ব্যবস্থা অবলম্বন করেনি। তারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে, তাই অনুন্নত সমাজের মানুষ বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে কোনো কিছু সুবিধা পায়নি বলে সমর্থন করতেও পারছে না।

অকুতোভয় আম্বেদকর লণ্ডনের বুকে বসে ঘোষণা করেন, বলপ্রয়োগ করে ভারতবাসীকে দমিয়ে রাখতে পারবে না ইংরাজরা। ভারতীয়দের কাছে গ্রহণযোগ্য সংবিধান ছাড়া ভারত সম্বন্ধে যে ব্যবস্থাই বৃটিশ সরকার নিক না কেন, তা স্থায়ী হবে না। হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেন যে, ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে বৃটিশ সরকার আর নিজেদের খেয়ালখুশি মত শাসন চালাতে পারবে না।

লণ্ডনের সংবাদপত্র আম্বেদকরকে শুধু অনুন্নত শ্রেণীর নেতা নয়, একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে স্বীকৃতি দিল। তাঁর স্পষ্টবাদীতা ও রূঢ় সত্যভাষণে রাজশক্তি তাঁকে বিপ্লবীদের দলের লোক মনে করেছিল।

সব কিছুর ওপরে অনুন্নত শ্রেণীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আম্বেদকর সদাজাগ্রত ছিলেন। এই সময়ে ডঃ আম্বেদকর 'মৌলিক অধিকারের ঘোষণাপত্র' রচনা করে দেশের অন্যান্য নাগরিকদের সঙ্গে নির্যাতিত দলিত সমাজের জনগণের সমানাধিকার দাবী করেন। ভারতের সমাজব্যবস্থা থেকে অস্পৃশ্যতার বিলোপ সাধন এবং অনুন্নত শ্রেণীর জনগণের ওপর থেকে সরকারী ও সামাজিক সব রকমেব বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করে বৈষম্য দূর করার জন্য আইন তৈরী করা হোক এটাও ছিল আম্বেদকরের দাবীর অন্যতম বিষয়।

এদিকে সংখ্যালঘুদের সাব-কমিটি তার প্রতিবেদনে বলল যে, যদি অনুন্নত শ্রেণীবর্গের ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দের দাবী মেনে না নেওয়া হয় তবে তারা স্বায়ত্ত-শাসন বিষয়ক নতুন সংবিধানকে সমর্থন করবে না।

ভোটাধিকারের প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট সাব-কমিটির সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করে আম্বেদকররা জানালেন যে, অবিলম্বে সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবীকে মেনে না নিলে দেশের অধিকাংশ জনগণ স্বায়ত্তশাসনের সুফল থেকে বঞ্চিত হবে।

শেষ পর্যন্ত প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনায় ঐকমত্য হল না। তারা অন্যতম কারণ মুসলিম নেতাদের কিছু অত্যন্ত অনৈতিক দাবী উদারপন্থী হিন্দু নেতাদের কাছেও গ্রহণযোগ্য হল না। অনুন্নত শ্রেণীদের দাবী-দাওয়াকেও মুসলিম নেতারা সমর্থন করেননি, এই আশংকায় যে দাবীগুলি আদায় হয়ে গেলে শক্তিশালী হয়ে উঠে তারা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে সহযোগিতা করে মুসলিমদের দাবীর বিরোধীতা করতে পারে।

ব্যর্থ হলেও প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের একটা সুফল ভোগ করেছিল নির্যাতিত শ্রেণীর মানুষ, এবং তা হল এই যে—বিশ্ব-বাসী এই প্রথম অনুন্নত শ্রেণীদের প্রকৃত দুরবস্থার কথা জানতে পারল এবং সহানুভূতিও আদায় করতে পারল। এই বৈঠকের ফলশ্রুতি ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ভবিষ্যতের দৃপ্ত ভূমিকার পথ সুগম করে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসে ৭ই সেপ্টেম্বরে ১৯৩১। এই বৈঠকটির গুরুত্ব আগের বৈঠকের তুলনায় অনেক বেশি ছিল তার কারণ এতে বেশ কিছু নতুন ও নামী নেতারা অংশ নেন; তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মুসলিমলীগের সভাপতি মহম্মদ ইকবাল, খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে এস. কে. দত্ত; আর কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একমাত্র প্রতিনিধি মহাত্মা গান্ধী, এছাড়া শিল্পপতি জি. ডি. বিড়লা, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, সরোজিনী নাইডু ইত্যাদি বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী নেতারাও ছিলেন।

এই বৈঠকে যোগ দিতে যাবার আগে গান্ধীজীর আমন্ত্রণে আম্বেদকর সাক্ষাৎ করতে যান প্রথমোক্তের সঙ্গে। দুই বিরল ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারটি সব মহলেই দারুণ ঔৎসুক্যের

সঞ্চার করে। ডঃ আম্বেদকর নিজস্ব মত তীক্ষ্ন ভাষায় প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন নি, এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে গান্ধীজীর মুখের ওপরেই তাঁর সমালোচনা করেন এবং বলেন যেহেতু গান্ধীজী নিজমুখে বেদ-গীতায় বর্ণিত বর্ণাশ্রমে বিশ্বাসের কথা স্বীকার করেছেন তাই গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলন সম্পর্কে তিনি আস্থা রাখতে পারছেন না।

এই সাক্ষাৎকারের পরিণামে আম্বেদকর বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন যে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজী কি ভূমিকা নিতে চলেছেন, এবং সে বিষয়ে প্রস্তুত হতে লাগলেন আম্বেদকর।

ঐ বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো কমিটির সভায় গান্ধীজী নিজেকে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল ভারতীয়ের একমাত্র প্রতিনিধি বলে দাবী করে বলেছিলেন যে স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থায় কীভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে প্রতিনিধি নেওয়া হবে তার সিদ্ধান্ত তিনি মুসলমান, শিখদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে ফেলেছেন, এদের বাইরে আর কোনো প্রতিনিধিকে তাঁর কংগ্রেস স্বীকৃতি দিতে নারাজ।

সংঘর্ষের আভাস পেয়ে আম্বেদকর ঐ কমিটির মিটিংয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে ইচ্ছুক ভারতীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে এক জটিল সমস্যার কথা তুলে ধরলেন, ফলে অনেক রাজা-মহারাজা যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের প্রশ্নে দ্বিধান্বিত হয়ে উঠেছিলেন।

এরপর বসল সংখ্যালঘুদের সাব-কমিটির মিটিং। এখানে গান্ধী-আম্বেদকর সংঘর্ষ প্রকাশ্যে চলে এল। এই মিটিংয়ের আগে গান্ধীজীর ছেলে দেবদাস গান্ধীর উদ্যোগে সরোজিনী নাইডুর বাসস্থানে গান্ধীজীর সঙ্গে আম্বেদকরের সাক্ষাৎ হয়েছিল। গান্ধীজী আসল উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বলেছিলেন অন্য সদস্যরা আম্বেদকরের প্রস্তাব মেনে নিলে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে আপত্তি জানাবেন না।

এদিকে মুসলিম নেতাদের ১৪ দফা দাবী মেনে নেওয়ার

ব্যাপারে গোপন চুক্তি করে গান্ধীজী বলেছিলেন মুসলিমরা যেন অনুন্নতদের দাবীর সমর্থন না করেন। আম্বেদকর এ খবরটি আগে-ভাগে জেনে গিয়েছিলেন, তাই আগা খাঁদের সঙ্গে সমঝোতায় আসার জন্য গান্ধীজী মিটিং মুলতুবী করার প্রস্তাব তোলেন এবং মালব্যজী তা সমর্থনও করেন।

ঐ সাত দিনের মধ্যে মুসলিম ও শিখ নেতাদের সঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছতে না পেরে গান্ধীজী মিটিংয়ের ব্যর্থতা স্বীকার করলেন বটে কিন্তু দোষটা চাপালেন অন্যদের ঘাড়ে। তিনি অভিযোগ তুলেছিলেন বৈঠকে যোগদানকারীর অধিকাংশই সংশ্লিষ্ট জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নন। অতএব এই সাব-কমিটির বৈঠক মুলতুবী রাখা হোক্।

ক্ষুব্ধ আম্বেদকর তীব্র ভাষায় গান্ধীজীকে আক্রমণ করে বলেন যে গান্ধীজী নিজেদের ব্যর্থতা স্বীকার না করে অপরের কাঁধে দোষ চাপাচ্ছেন এটা ঠিক নয়, তাছাড়া অস্পৃশ্যদের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে যে দাবী গান্ধীজী করছেন তা সত্যের অপলাপ মাত্র।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দের সমস্যার কোনো সর্বসম্মত সমাধান খুঁজে না পেয়ে সভাপতি র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড নিজের হাতে এই ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতা চাইলেন সব সদস্যদের কাছ থেকে। আম্বেদকরই একমাত্র ব্যতিক্রম যিনি সম্মতি না দিয়ে বলেছিলেন তাঁর দাবী-গুলির নামমাত্র পরিবর্তনও তিনি চান না। অতএব দ্বিতীয় বৈঠকও তেমন ফলপ্রসূ হল না।

তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক হয় ১৯৩২ সালের ১৭ই নভেম্বর। তার আগে গঙ্গা দিয়ে অনেক জলস্রোত বয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক থেকে ফিরে আসার পর ভোটাধিকার কমিটির অধিবেশনে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পেলেন ডঃ আম্বেদকর। ইত্যবসরে সারা দেশ ঘুরে ঘুরে জনমত যাচাই করতে গিয়ে আম্বেদকর দেখলেন যে নির্যাতিত শ্রেণীর সব মানুষই পৃথক নির্বাচনের দাবী জানিয়েছেন। অন্যথায় সংরক্ষিত আসনে যুক্ত

নির্বাচন হলে সংখ্যায় অধিক বর্ণহিন্দু ভোটদাতাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠতে হবে এদের।

আম্বেদকর যখন এইভাবে জনমত গড়ে তুলতে ব্যস্ত তখন অপ্রত্যাশিত আঘাত এল তারই সহযোদ্ধা কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্যাতিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এম. সি. রাজা এবং ডঃ মুঞ্জে, যিনি এতকাল পৃথক নির্বাচনের দাবীর বলিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন।

সারা দেশ থেকে বিভিন্ন সংগঠন এগিয়ে এলো ডঃ আম্বেদকরের সমর্থনে। ১৯৩২ সালে কলকাতায় অ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত বেঙ্গল নমঃশূদ্র অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলনে আম্বেদকরের সব সিদ্ধান্তকে সঙ্গত ঘোষণা করা হয় এবং বিরুদ্ধ সমালোচকদের নিন্দা করে প্রস্তাবও নেওয়া হয়েছিল ঐ সম্মেলনে। ঐ সভার সভাপতি ছিলেন বঙ্গসন্তান ডাঃ কালীচরণ মণ্ডল। হিন্দু-মহাসভার পক্ষ থেকে বীর সাভারকরও বিপুলভাবে সমর্থন জানালেন আম্বেদকরকে।

ভোটাধিকার কমিটিতে পেশ করা আলাদা প্রতিবেদনে আম্বেদকর নির্যাতিত, অনুন্নত শ্রেণীর সংজ্ঞা নির্ধারণ করলেন—তাতে বলা হয় হিন্দুদের সমাজে যে-সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে অস্পৃশ্য বলা হয় তারাই নির্যাতিত শ্রেণী নামে চিহ্নিত হবে।

ঐ কমিটি যে বিশেষ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল তাতে অনুন্নত শ্রেণীর মনোবল বৃদ্ধি পেল। প্রস্তাবটি এই—নির্যাতিত ও অনুন্নত শ্রেণীর জনগণকে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে যদি কেউ বা কারা বয়কট আন্দোলন শুরু করে তবে তারা ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা অনুসারে দণ্ডিত হবে।

রাজভোজ ও মুঞ্জের বিরোধীতা সমানে চলছিল, এমন কি আম্বেদকরের সমর্থনে বড় সভা ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টাও করেন তাঁরা। ভবিষ্যতে আরও গণ্ডগোল পাকাতে পারেন এই আশংকায় আম্বেদকর মনস্থ করলেন তিনি লণ্ডনে গিয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে পৃথক নির্বাচনের দাবীর গুরুত্ব বোঝাবেন।

‘৩২ সালের জুন মাসে তিনি ইংল্যান্ডে গিয়ে এক বিশাল স্মারক-লিপি তুলে দিলেন বৃটিশ মন্ত্রীপরিষদের সামনে।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ১৯৩২ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে তাঁর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ার সংক্রান্ত রায় দিলেন। তাতে প্রাদেশিক আইন সভায় নির্যাতিত শ্রেণীর জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবী স্বীকৃত হয়, তাঁরা দুটি করে ভোট দিতে পারবেন একটি সাধারণ প্রার্থীকে, অন্য ভোটটি নিজেদের মনোনীত প্রার্থীকে। ঐ রায়ে মুসলিম, খৃষ্টান, শিখ ও ইউরোপীয়দের অনুরূপ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, ফলে সংসদীয় রাজনীতিতে হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ট হয়ে পড়ল। কংগ্রেস তথা হিন্দুরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। যারবেদা জেলে বন্দী অবস্থায় থাকা গান্ধীজী প্রমাদ গুনলেন এবং নির্যাতিত শ্রেণীর রাজনৈতিক সত্তাকে ধ্বংস করার জন্য তাঁর নিজস্ব চরম অস্ত্র প্রয়োগ করলেন—অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার রায়ের প্রতিবাদে আমরণ অনশন শুরু করলেন তিনি।

কিন্তু এই অনশন করার কোনো নৈতিক অধিকার গান্ধীজীর ছিল না, কারণ দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে সংখ্যালঘু কমিটির ব্যর্থতার পরে একমাত্র আম্বেদকর ব্যতিরেকে বাকী সব সদস্য এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব লিখিত ভাবে দিয়ে এসে-ছিলেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে, এখন তাঁর দেওয়া রায়ের বিরোধীতা গান্ধীজী করেন কি করে?

ভারতের তৎকালীন অবিসম্বাদিত জনপ্রিয় নেতা গান্ধীজীর আমরণ অনশনের কথা শুনে সব বড় বড় নেতারা ছুটলেন আম্বেদকরের কাছে। কারণ গান্ধীজীর প্রাণ বাঁচাতে হলে আম্বেদকরের সহযোগিতা অপরিহার্য। এতদিন পরে ঐ সব নেতারা আম্বেদকরের গুরুত্ব বুঝতে শুরু করলেন। কারণ এটা তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে ডঃ আম্বেদকর সম্মতি না দিলে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বাঁটোয়ারার রায়ে কোনো পরিবর্তন করবেন না।

অনুরোধ, উপরোধ, এমন কি আম্বেদকরের প্রাণনাশের হুমকি

পর্যন্ত আসতে লাগল, দাবী একটাই গান্ধীজীর প্রাণ বাঁচাবার জন্য আম্বেদকরকে তাঁর দাবী প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

দৃঢ় সংকল্পে অটল আম্বেদকর কোনো ভ্রূক্ষেপই করলেন না। তাঁর বক্তব্য খুবই স্পষ্ট—ব্যক্তিগতভাবে তিনি সবার কথা মানতে রাজী আছেন, কিন্তু কোনো কিছুর বিনিময়েই তিনি দলিত সমাজের স্বার্থক্ষুণ্নকারী বা অধিকার ক্ষুণ্নকারী কাজ করতে অপারগ। গান্ধীজী যখন অতীতে দলিতদের সমস্যাকে কোনো গুরুত্বই দেন নি, তবে আজ কেন ঐ প্রশ্নে তিনি আমরণ অনশনের হুমকি দিচ্ছেন। ভারতের জাতীয় ঐক্যবোধ বিনষ্ট হয়ে যাবে এই আশংকায় গান্ধীজী যদি অস্পৃশ্যদের পৃথক নির্বাচনের দাবীকে মানতে রাজী না হন তবে কেন তিনি মুসলমান, খৃষ্টান, শিখদের অনুরূপ দাবী সমর্থন করেছেন ? এর কোনো উত্তর গান্ধীজী বা তাঁর অনুগামীদের ছিল না।

আম্বেদকরের অনমনীয় মনোভাব দেখে শংকিত কংগ্রেস নেতারা বোম্বাইতে একটা মিটিং ডাকলেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ, তেজবাহাদুর সপ্রু, কমলা নেহেরু, সাভারকর, অ্যানি বেসান্ত, ডঃ মুঞ্জে সহ বহু বিখ্যাত নেতারা যোগ দিলেন তাতে, বলা বাহুল্য আম্বেদকরও আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। ঐ সভায় ডঃ আম্বেদকর স্পষ্ট ভাষায় জানালেন যে—নির্যাতিত শ্রেণীদের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করছেন গান্ধীজী অনশন শুরু করে। গান্ধীজী যদি কোনো বিকল্প প্রস্তাব দেন তবে তা ভেবে দেখবেন তাঁরা, তবে এটা ভুললে চলবে না যে গান্ধীজীর জীবনের মূল্যেও নির্যাতিত শ্রেণীর জনগণের স্বার্থবিরোধী কোনো প্রস্তাব তিনি মেনে নেবেন না।

আম্বেদকরের এই কথা শুনে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বিপদের আশংকা করলেন। তাঁরা ভাবতে পারেন নি যে আম্বেদকর গান্ধীজীর জীবনের এই মূল্যায়ন করবেন। অনেক ভেবে চিন্তে গান্ধীজী নির্যাতিত শ্রেণীর জন্য আসন সংরক্ষিত করার ব্যাপারটি মেনে নিলেন। কিন্তু আম্বেদকর এতে বিগলিত হলেন না।

তেজবাহাদুর সপ্রুর প্রাইমারী-সেকেণ্ডারী নির্বাচন সূত্রও গান্ধীজীর মনঃপূত হল না।

শেষে বাধ্য হয়ে কংগ্রেস নেতারা চাইলেন আম্বেদকরের সঙ্গে যারবেদা জেলে অনশনরত, গান্ধীজীর দেখা হোক।

জেলের মধ্যে ঘটল সাক্ষাৎকার। গান্ধীজীর অনশনক্লিষ্ট করুণ মুখ দেখে বিচলিত হতে হতে নিজেকে সামলে নিলেন আম্বেদকর। দুজনেই দুজনের ব্যক্তিত্বকে সম্মান করেন, অথচ মনের জগতে বিপরীত মেরুতে বসবাসকারী দুই নেতার কেউই হারতে রাজী নয়। নানা কথার মধ্যে গান্ধীজী প্রশ্ন করেছিলেন, 'ডক্টর, আপনি কি আমার প্রাণ বাঁচাতে চান?' উত্তরে ডঃ আম্বেদকর বলেছিলেন, 'আপনি যদি অস্পৃশ্যদের কল্যাণসাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন তবে আমরা আপনাকে আমাদের নেতা হিসেবে মাথায় করে রাখব।'

গান্ধীজী বুঝে গেলেন আম্বেদকর মাথা নোয়াবেন না, তখন তিনি সামান্য শর্তে আম্বেদকরের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। এবং যুক্ত নির্বাচনের ব্যাপারে কটি আসন কোন্ রাজ্যে সংরক্ষিত হবে তা স্থির করা হল সর্বসম্মতিক্রমে। গণভোটের বিষটিকেও শর্তহীন করে রাখা হল।

শেষে স্বাক্ষরিত হল চুক্তি, যা 'পুণা-চুক্তি' নামে খ্যাত। আপাত দৃষ্টিতে ভাল হলেও এই চুক্তির পশ্চাদপটের ইতিহাস কলঙ্কিত হয়েই থাকল, কারণ এতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার যে সব সুযোগ-সুবিধা অস্পৃশ্যরা পেতে পারত তা গান্ধীজীর কূটকৌশলে নির্ভর করল উচ্চবর্ণের খেয়ালখুশির ওপর।

পুণা চুক্তির ফলে কেন্দ্র ও রাজ্য আইনসভায় অধিক সংখ্যক আসন পেলেও নিম্নজাতির রাজনৈতিক ভাবমূর্তি ও শক্তি অনেকটাই ক্ষুণ্ণ হল। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার রায় মেনে চললে যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে উচ্চবর্ণকে ভোটের জন্য যেতে হত নিম্ন-বর্ণের ভোটারদের কাছে। গান্ধীজী কৌশলে তাদের সংরক্ষিত আসন দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন এবং উচ্চবর্ণের সম্মান অক্ষুণ্ণ

থেকে গেল। তাছাড়া সংরক্ষিত আসনগুলির ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ ভোটার উচ্চবর্ণের হিন্দু, ফলে তাদের সমর্থন ছাড়া নিম্নবর্ণের প্রার্থীদের জয়লাভের সম্ভাবনা নেই। এবং কার্যতঃ হলোও তাই। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হলেন আম্বেদকরের দলের প্রার্থীরা। আগে বুঝতে পারলে পুণা চুক্তিতে নিশ্চয়ই স্বাক্ষর করতেন না আম্বেদকর।

তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকেও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি যোগ দেন নি। এই বৈঠকের প্রধান কাজ ছিল প্রথম দুটি বৈঠকে সম্পাদিত কাজকর্মের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা। এতে বলা হয় যে, ভারতের বর্তমান অবস্থায় সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তিত হতে দেওয়া হবে না ; অনুন্নত শ্রেণীর মানুষদের জন্য ভোটাধিকারের সঙ্গে মহিলাদেরও ভোটাধিকার দেওয়া হবে।

তৃতীয় বৈঠকে রাজন্যবর্গও তেমন উৎসাহ দেখালেন না। তাঁরা সময় নিতে লাগলেন। মুসলিম নেতারা হিন্দু নেতাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছিলেন না। অস্পৃশ্যদের ব্যাপারেও মুসলিম নেতাদের উদাসীন মনোভাব দেখে আম্বেদকর দায়িত্বশীল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হয়ে গেলেন। এই বৈঠকও তেমন ফলপ্রসূ হল না।

এরপর বৃটিশ সরকার একটি জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটি গঠন করে ভারতের জন্য নতুন শাসনতন্ত্র রচনা করার দায়িত্ব দিলেন। এই কমিটি তার প্রতিবেদনে ভারতের জন্য ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫, পাশ করার কথা বলা হল। কিন্তু ভারতের রাজন্যবর্গ এই যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে অস্বীকার করায় সমগ্র ভারতকে নিয়ে অভীপ্সিত যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হল না।

তিনটি গোলটেবিল বৈঠকের নীট ফল ভারতবাসীর সামগ্রিক উপকার না হলেও অনুন্নত শ্রেণীর জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক সত্তা স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এবং আম্বেদকর একজন পণ্ডিত ও সংবিধান-বিশারদ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন।

ষষ্ঠ পর্ব

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রয়োগ করার পূর্বে প্রস্তুতি হিসাবে বৃটিশ সংসদের উভয় কক্ষের এক যৌথ কমিটি ১৯৩৩ সালে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করল। ঐ কমিটিতে বৃটিশ ভারতের ১৭ জন প্রতিনিধি এবং রাজন্যবর্গের ৭ জন প্রতিনিধি নেওয়ার কথা হল। ভারতের নেতারা এই শ্বেতপত্রের বিরোধীতা করলেন। এই কমিটিতে আম্বেদকর মনোনীত হয়েছিলেন অভ্যর্থনা কমিটির সদস্য হিসাবে। কিন্তু বর্ণহিন্দুদের চক্রান্তে আম্বেদকরের নাম শেষ পর্যন্ত বাদ দেওয়া হয়।

কমিটিতে অংশ গ্রহণ করতে যাবার আগে একটি সভায় আম্বেদকর ছাত্রদের সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে থেকে একাগ্র চিত্তে লেখাপড়া শেখার উপদেশ দিলেন। ঐ সভাতে তিনি বলেন যে তাঁর নিজের জীবনে শিক্ষাবিদ হবার স্বপ্ন ছিল, কিন্তু দেশের পরিস্থিতির জন্য তিনি বাধ্য হয়েছেন সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিতে।

১৯৩৩ সালের ৬ই মে লণ্ডনে পৌঁছলেন আম্বেদকর। হঠাৎ ওখানে তাঁর চোখের গুরুতর অসুখ দেখা দিল। কিন্তু শুধু চশমা নেবার পর দেখা গেল সেটা তেমন মারাত্মক নয়।

পুণা-চুক্তির ফলে অনুন্নত শ্রেণীরা অধিকতর সংখ্যায় সংরক্ষিত আসন পাওয়ায় উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, কারণ অস্পৃশ্য শ্রেণীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে পাশাপাশি বসে আইনসভার কাজে অংশ নেবে এটা তাঁদের কাছে অপমানজনক মনে হচ্ছিল। অনেকের সঙ্গে বঙ্গদেশের আইন পরিষদ পুণা-চুক্তি বাতিল করার প্রস্তাবও নিয়েছিল এই কারণ দেখিয়ে যে ঐ চুক্তিতে বঙ্গদেশের কোনো প্রতিনিধি ছিল না এবং বঙ্গদেশের অনুন্নত শ্রেণীর নেতাদের

দাবী মত ৫০ এর বদলে মাত্র ৩০ জন প্রতিনিধিকে মেনে নেওয়ার ব্যাপারটি মনঃপূত হয় নি তাঁদের বিস্মিত আম্বেদকর জানালেন যে পুণা-চুক্তির পরের দিন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পুণায় এসেছিলেন এবং বৃটিশ মন্ত্রীসভা ঐ চুক্তি মেনে নেওয়ার জন্য খুশির জোয়ারে ভাসতে ভাসতে তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছিলেন তাঁকে। সেই বঙ্গবাসীরাই এখন উল্টোসুরে গাইতে শুরু করেছেন ? এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে একটা কূটনৈতিক চাল দিলেন আম্বেদকর—তিনি বললেন পুণা-চুক্তির বদলে তিনি পূর্ব প্রস্তাবিত পৃথক নির্বাচনকে মেনে নিতে তৈরী।

কমিটিতে ইংল্যাণ্ডের বিশিষ্ট কূটনীতিবিদ উইলস্টন চার্চিলের সঙ্গে যে প্রচণ্ড বিতর্ক হয়েছিল তাতে শেষ পর্যন্ত আম্বেদকরই জয়লাভ করেন। তিনি আরেকবার জগৎবাসীকে দেখালেন সত্যের ও বৃহত্তর আদর্শের জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেন তাঁরা শেষ পর্যন্ত জয়ী হন। কূটনীতির সংগ্রামে আবার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন আম্বেদকর।

নভেম্বর মাসে যৌথ কমিটির অধিবেশন শেষ হল শ্বেতপত্রকে স্বাগত জানিয়ে। ভারতে ফিরে এসে আম্বেদকর জানালেন যে পুণাচুক্তি বহাল থাকবে, এবং তার পূর্ণ সুযোগ নেবার জন্য জোরদার সংগ্রাম চালাবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে দলিতদের।

সপ্তম পর্ব

পর পর তিনটি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান এবং পুণাচুক্তির ব্যাপারে মাথা ঘামানো, ও আবার যৌথকমিটির মিটিং-এ যোগ দিতে বিদেশ যাত্রা ইত্যাদির ফলে আম্বেদকরের স্বাস্থ্য বেশ ভেঙ্গে পড়েছিল। বিশ্রাম ছাড়া গতি নেই। তাই সকলের পরামর্শে তিনি একটু নির্জনে চলে যেতে মনস্থ করলেন। প্রথমে বোরদি এবং

পরে সমুদ্রতীরবর্তী মহাবালেশ্বরে অস্থায়ী ভাবে থাকতে শুরু করলেন। এখানে বসেই তিনি এবার নিজের বাড়ী তৈরী করার কথা চিন্তা করেছিলেন।

১৯৩৪ সালের মাঝামাঝি ফিরে এলেন বোম্বাই; কর্মবীর মানুষেরা বেশিদিন চুপচাপ বসে থাকতে পারেন না। আবার ওকালীতির কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এই সময়ে স্থানীয় সরকারী ল' কলেজে তিনি আংশিক সময়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। সব মিলিয়ে আর্থিক দিকটি তাঁর বেশ ভাল হয়ে এসেছে। জীবনের বেশির ভাগ সময় বস্তিতে আর ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের দুখানি ঘরে কেটে গেছে তাঁর, এখন একটু স্বাচ্ছন্দ চান। বিশেষ করে তাঁর প্রচুর বই রাখার ভাল জায়গা থাকা দরকার। কোলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং লণ্ডনে থাকাকালীন তিনি সব মিলিয়ে ২000 বই কিনেছিলেন, কিন্তু তাড়াহুড়ো করে লণ্ডন থেকে ফিরে আসার সময় কুক অ্যাণ্ড কেলভির জাহাজে বইগুলি আনার ব্যবস্হা করে-ছিলেন, কিন্তু তখন চলছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ঐ জাহাজের সঙ্গে তাঁর সব বইও বিনষ্ট হয়েছিল, এবং সে আক্ষেপ তিনি জীবনভোর ভুলতে পারেন নি। অতএব নিজস্ব বাড়ী চাই। অবশেষে নানা ঝঞ্ঝাটের পর দাদরের হিন্দু কলোনীতে তাঁর বাড়ী তৈরী হল। বেশ জমকালো দোতলা বাড়ী। নাম দিলেন 'রাজগৃহ'। দোতলায় ছিল তাঁর গ্রন্হাগার ও অধ্যয়ন কক্ষ, একতলা ব্যবহৃত হত পারি-বারিক প্রয়োজন মেটাতে।

ওদিকে গান্ধীজীর আন্দোলনে কিঞ্চিত ভাটা পড়তে শুরু করেছে। ১৯৩৪-এর মাঝামাঝি জাতীয় কংগ্রেসের ওপর থেকে বৃটিশ সরকার নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতেই জোর কদমে আবার সাংগঠনিক কাজে নেমে পড়ল গান্ধীজীর অনুগতরা।

প্রথমেই তারা শ্বেতপত্র ও সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের বিরোধীতা করতে শুরু করল। সেই সন্ধিক্ষণে ভারত সরকার সেণ্ট্রাল অ্যাসেমব্লির নির্বাচনের প্রস্তাব উত্থাপন করল। নির্বাচনের প্রাক্কালে

নাগপুরের অনুন্নত শ্রেণীর নেতা জি. এ. গাভাই গান্ধীজীর কাছে অনুরোধ জানালেন পুণাচুক্তি সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট মতামত ঘোষণা করতে এবং তার দলের প্রতিনিধিদের সমর্থন যাতে কংগ্রেসীরা করেন তার জন্য দরবারও করলেন। কিন্তু গান্ধীজী সেই অনুরোধে সাড়া তো দিলেনই না, উল্টে জানিয়ে দিলেন যে পুণাচুক্তির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতেই হবে।

অতিমাত্রায় সন্তুষ্ট হয়ে আম্বেদকর গান্ধীজীকে অভিনন্দন জানান এবং তাঁকে এ অনুরোধও জানান যাতে জাতীয় কংগ্রেস দলের আসন্ন সম্মেলনে যেন সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদকে সমর্থন জানিয়ে প্রস্তাব নেওয়া হয়। তিনি আরও বলেন যে পুণাচুক্তি ভাঙ্গার জন্য যারা গান্ধীজীর কাছে অনুরোধ জানিয়েছে তারা তার পরিণাম জানে না। কিন্তু নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস, ঐ কথা বলার সময় আম্বেদকর নিজেও জানতেন না যে ভবিষ্যতে ঐ পুণা-চুক্তিই তাঁর গলায় ফাঁস হয়ে বসবে।

এই সময়ে কর্মসূত্রে আম্বেদকরকে যেতে হয়েছিল দৌলতা-বাদে। সেখানকার প্রাচীন ঐতিহাসিক সবান্ধব দেখতে গিয়ে একটা পুকুরের জলে যখন হাত পা ধুচ্ছিলেন তখন এক বৃদ্ধ মুসলমান সোরগোল শুরু করে দেয়—যে অস্পৃশ্যরা পুকুরের জল অপবিত্র করে দিচ্ছে। দেখতে দেখতে বহু মুসলমান তাঁদের ঘিরে ধরে। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে যাবার আগে আম্বেদকর তাদের শান্ত করে একটা কথা বলে—তিনি যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তবে তাঁকে ঐ জল স্পর্শ করতে দেওয়া হবে কিনা। তখনকার মত বিপদ এড়ানো গেলেও, তারপর থেকে সব সময়ে একজন সশস্ত্র প্রহরী তাঁদের সঙ্গে ঘুরতো যাতে কোনো পুকুরের জল তাঁরা অপবিত্র করে না ফেলেন।

ওদিকে যৌথ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৩৪ সালের ১৯শে ডিসেম্বর বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভারত-বিল পেশ করা হয়। তাতে সরকারে আইন পরিষদ ছাড়া দ্বিতীয় কক্ষের সুপারিশ করা

হয়েছিল, আম্বেদকর অনেক আগে থেকেই ওর বিরুদ্ধে ছিলেন ; এবারও প্রতিবাদ জানালেন, কারণ দ্বিতীয় কক্ষের নির্বাচনে অনুন্নত শ্রেণীদের নির্বাচিত হবার কোনো সুযোগই উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা যে দেবে না এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

ঐ বিল নিয়ে বিতর্কের সময় ইংল্যাণ্ডের রক্ষণশীল দলের সাংসদ এ. ডবলু. গুডম্যান জোরালো ভাষায় অস্পৃশ্যদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিবাদ জানান। ভারতেও ঐ প্রতিবেদন নিয়ে বিতর্ক চলছিল। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্পর্কে ন যজৌ ন তস্থৌ নীতি নিয়ে পরোক্ষে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মুসলিমলীগের দাবীকে সমর্থন জানালেন।

আইন কলেজে অধ্যাপনা করতে করতে গোটা পরিস্থিতির উপর লক্ষ্য রাখছিলেন আম্বেদকর। পুণা চুক্তির বিরুদ্ধে বর্ণ-হিন্দুদের সরব আপত্তি তাঁকে মর্মব্যথা দিচ্ছিল, কিন্তু পারিবারিক কারণে তিনি প্রতিবাদে নিজেকে জড়াতে চাইছিলেন না। বিশেষ করে স্ত্রী রমাবাইয়ের অসুস্থতা তাঁকে বেশ উদ্বেগের মধ্যে রেখেছিল।

ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে যে, যে-সব বিখ্যাত নেতা বা মনীষী নিজেদের দেহমন দেশের জন্য বা পরার্থে উৎসর্গ করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই দেবীসদৃশা সহধর্মিণী পেয়েছিলেন, যাঁরা সারা জীবন ধরে যবনিকার অন্তরালে থেকে তাঁদের স্বামীদের সেবায় নিজেদের সব সুখ বিসর্জন দিয়ে সংসারধর্ম পালন করে গেছেন। আম্বেদকরের সতীসাধ্বী স্ত্রীও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন না।

জীবনের বেশির ভাগ সময় আর্থিক অনটন, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকতে থাকতে রমাবাইয়ের স্বাস্থ্য ভিতর থেকে ভেঙ্গে পড়ছিল। এর ওপর ধর্মপ্রাণা ঐ মহিলা স্বামী-সন্তানের কল্যাণ কামনায় নিয়মিত কঠোর ব্রত ও উপবাস ইত্যাদি করার ফলে দেহের পুষ্টিও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বায়ু পরিবর্তনের জন্য আম্বেদকর

স্ত্রীকে ধারওয়ারে নিয়েও গিয়েছিলেন, কিন্তু তাতেও তেমন সুফল পাওয়া যায় নি। নিজের লেখাপড়া, বিদেশে থাকা, দলিত সমাজের হয়ে অবিরাম সংগ্রাম করতে ব্যস্ত থাকায় পরিবারের দিকে নজর দেবার সময়ও তিনি পেতেন না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মৃত্যু-জনিত শোকের আঘাত। আম্বেদকরের তিন পুত্র ও এক কন্যা অকালে মারা যায়, তাই জীবনে গৃহ, অর্থ, সম্মান ইত্যাদি পাবার পরও আম্বেদকরদের পরিবারে সুখ-শান্তি ছিল না। দারিদ্রের সঙ্গে, অন্যায় অবিচারের সঙ্গে সংগ্রামে লৌহমনা ডঃ আম্বেদকর কিন্তু এই পারিবারিক আঘাত সহ্য করতে অক্ষম ছিলেন। ফলে সংসার-জীবন থেকে ক্রমশঃ তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছিলেন।

সব রকম চিকিৎসা করিয়েও স্ত্রীকে বাঁচাতে পারলেন না, তাঁর দুঃখের দিনের সঙ্গিনী সুখের দিনে আসার মুখে তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন। ১৯৩৫ সালের ২৭শে মে রমাবাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

রমাবাই ছিলেন ভারতীয় নারীর আদর্শ প্রতিরূপ। সামান্য দরিদ্র পরিবারের কন্যা এই নারী নীরবে স্বামীর সংগ্রামে পরোক্ষে সাহায্য করে চলেছিলেন। জীবনের সব রকমের দুঃখকষ্টকে তিনি প্রশান্ত চিত্তে মেনে নিয়েছিলেন বিধিলিপি বলে। পরিবারের সবাই আম্বেদকরকে বাড়ীতে 'সাহেব' বলে ডাকতেন। ঐ সাহেবের সেবার জন্য রমাবাই অতন্দ্র প্রহরায় থাকতেন সর্বক্ষণ, এমন কি সাহেব বাড়ীর বাইরে গেলেও তিনি অনুক্ষণ স্বামীর কথাই চিন্তা করতেন। প্রতি শনিবার তিনি শুধু জল আর ছোলা খেয়ে ব্রত পালন করতেন। স্বভাবে শান্ত, নিরীহ, ভদ্র ও সংযতবাক্ মহিলা ছিলেন রমাবাই।

অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা এই মহিলা পাণ্ডারপুরে তীর্থযাত্রা করতে চেয়েছিলেন, যেখানে প্রতি বছর লক্ষাধিক ভক্ত তীর্থ করতে আসতেন। অস্পৃশ্যের ঘরণী হওয়ায় তাঁকে দূর থেকে দেবতাকে প্রণাম করতে হত। স্ত্রীর আত্মসম্মান এইভাবে ক্ষুণ্ণ হতে দেখে

একবার আম্বেদকর বলেছিলেন—ওখানে যদি আমাদের মত সৎ ধর্মপ্রাণদের ঢুকতে না দেওয়া হয় তবে আমি একটা আলাদা পাণ্ডারপুর গড়ে তুলবো। এ থেকে বোঝা যায় কী পরিমাণ ভালবাসতেন আম্বেদকর তাঁর স্ত্রীকে।

আম্বেদকর একথা মনে মনে জানতেন যে তাঁর জীবনের উন্নতির মূলে ঐ নারীর অবদান কতটা। নিজের স্নেহপরায়ণা মাতা এবং আদর্শ পিতার মৃত্যুর পর তাঁকে পরম মমতায় আড়াল করে রাখতেন যে স্ত্রী, তিনি আজ লোকান্তরিতা। এই আঘাত আম্বেদকরের পক্ষে ছিল সহ্যাতীত। মধ্যবয়স্ক একজন সংগ্রামী অথচ জ্ঞানতপস্বী পুরুষ স্ত্রীর মৃত্যুতে এতই বিহ্বল হন যে তিন দিন তিনি ঘরের বাইরে আসেন নি। শোকে মুহ্যমান স্বামীকে কেউ শান্ত করতে পারছিলেন না। 'রাজগৃহ' তাঁর কাছে শ্মশানবৎ হয়ে উঠল।

আম্বেদকরের স্ত্রী বিয়োগের খবর পেয়ে হাজার হাজার অনুগামীরা হাজির হলেন 'রাজগৃহে', যেখানে শোকের সাগরে নিমজ্জিত আম্বেদকর বালকের মত কাঁদছিলেন। সৎকার ক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন প্রায় দশহাজার নরনারী। আপোষহীন আম্বেদকর হিন্দুধর্মের পারলৌকিক ক্রিয়া না মেনে মাহার পুরোহিত ডেকে যথারীতি ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করলেন।

পতিব্রতা স্ত্রী হিসাবে স্বামীকে নীরবে সেবা করা সত্ত্বেও, রমাবাই কিছুতেই বুঝে উঠতে পারতেন না এত সভা-সমিতি করে প্রতিবার এমন কি কথা লোকজনকে বলতে হয়। তাই সভা-সমিতির উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে তাঁর বেশ একটা অভিযোগও ছিল। শেষের দিকে বেশ কয়েকবার আম্বেদকরকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রান্ত হবার খবর পেয়ে রমাবাই আতঙ্কিত হয়ে থাকতেন, স্বামীকে একলা যেতে দিতে রাজী হতেন না। একবার একটা সভায় গণ্ডগোল হবার খবর শুনে রমাবাই জেদ ধরেছিলেন তিনি নিজে যাবেন, স্বামীর পাশে থাকবেন। সে যাত্রায় অনেক কষ্ট করে স্ত্রীকে বিরত

করতে পেরেছিলেন।

রমাবাইয়ের মত আদর্শ নারী শুধু অতীত কেন বর্তমান সমাজেও যে সুদুর্লভ একথা অনস্বীকার্য।

সপ্তম পর্ব

তাঁর জীবনের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী, মানব-সেবায় উপযুক্ত সঙ্গিনী এবং জীবনসাথী রমাবাইকে হারিয়ে আম্বেদকর প্রায় পাগলের মত হয়ে যান। মাথা নেড়া করে, গেরুয়া পরে যখন পাঁচজনের সামনে আসতেন তখন বিলিতি পোষাক পরা সাহেব আম্বেদকরকে দেখে সবাই বিস্মিত হয়ে যেতেন। প্রায় যোগীর জীবন যাপন করতে শুরু করেছিলেন তিনি। কিন্তু বিশাল কর্মযজ্ঞের প্রধান হোতা কখনো ঐ ভাবে জগৎ-বিমুখ হয়ে থাকতে পারেন না। স্ত্রীর মৃত্যুর চার-পাঁচ দিন পরে তাঁকে সরকারী ল' কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হয়। পদটি তিনি আগেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং কলেজ পরিচালনার কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে নামতে হল তাঁকে। আইন কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে দেশের আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি যে বিশেষ যোগ্যতা ও ক্ষমতা পেলেন এটা তাঁর ভবিষ্যৎ পদক্ষেপের পক্ষে সুবিধাজনক হয়ে উঠল।

১৯৩৫ সালের মাঝামাঝি বোম্বাইতে গুজব রটলো যে আম্বেদকর রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চলেছেন কারণ তাঁকে হয় বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারক বা মন্ত্রী করা হবে।

গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলনের পর ভারত সরকার একটা আইন পাশ করেছিল যে সরকারী পদে যোগ দিলে রাজ-নীতিতে অংশ গ্রহণ করা চলবে না। কিন্তু জজিয়তি বা মন্ত্রীত্বের সোনার খাঁচায় ঢোকার মত ইচ্ছা ছিল না আম্বেদকররূপী সিংহের। আম্বেদকরের মনোগত বাসনা ছিল ভারত-বিলের পরিপ্রেক্ষিতে যে নতুন সংবিধান লেখা হচ্ছে, তাতে অনুন্নত শ্রেণীদের উন্নতি-

বিধানের ব্যবস্থা করতে হলে তাঁকে সক্রিয় রাজনীতি করতেই হবে। হয়ত এর আগে জাতিয়তির প্রস্তাব এলে তিনি তা নিয়েও নিতে পারতেন।

এই সময় আম্বেদকর এমন একটা পদক্ষেপ নেবার কথা চিন্তা করছিলেন যা শুনে সমগ্র অনুন্নত সমাজ এবং বর্ণহিন্দুরাও চমকে উঠেছিল। ধর্মান্তরিত হবার কথা ভাবছিলেন তিনি। গত দশ বছর ধরে তীব্র সংগ্রাম চালিয়ে আসছিলেন আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের উন্নত সমাজের অংশীদার করাবার জন্য, কিন্তু সাফল্য দূরের কথা বারবার অপমানিত হতে হচ্ছিল তাঁকে।

চৌদার পুকুর সংক্রান্ত মামলা চালাবার ব্যাপারে তাঁকে মাঝে মাঝে মাহাদে যেতে হত। একবার বর্ষাকালে নদীতে বন্যা আসায় আম্বেদকরকে এমন একটা জায়গায় দুদিন কাটাতে হয়েছিল যেখানে অনুন্নত সম্প্রদায়ের কোনো মানুষ ছিল না, এবং ঐ দুদিন তাঁকে অনাহারে ও অনাশ্রয়ে থাকতে হয়। এই ঘটনায় তিনি এতই বিচলিত হন যে বাড়ী ফিরে একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে নিজেকে বন্দী করে রাখেন। এর আগে ১৯২৯ সালে জলগাঁও-এর সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন অস্পৃশ্যরা যেন এমন এক ধর্ম গ্রহণ করে যা তাদের সমান অধিকার দেবে অন্য মানুষদের সঙ্গে ওঠা-বসা করার, একসঙ্গে খাওয়ার। ফলে ১২ জন অস্পৃশ্য ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে নিয়েছিল। ঐ কথা বলাটা যে ছিল তাঁর ক্ষোভের অভিব্যক্তি সেটা ওরা বুঝতে পারেনি। কিন্তু ক্রমশঃ আম্বেদকর বুঝতে পারছিলেন যে বর্ণহিন্দুরা কিছুতেই অস্পৃশ্যদের মাথা তুলে দাঁড়াতে দেবে না, সামাজিক মর্যাদা দেবে না, অতএব একটা পথের সন্ধান করতেই হবে।

এই ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য সম্মেলন ডাকা হল। ১৯৩৫ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখে ইয়োলাতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে নানা রাজ্য থেকে প্রায় ১০,০০০ অস্পৃশ্য এসেছিল।

একটা সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে ইয়োলা সম্মেলনে আম্বেদকর

নিজে ধর্মান্তরিত হওয়ার ব্যাপারে ঘোষণা করবেন। এটা এক ধরনের পলায়নী মনোবৃত্তি, যা আম্বেদকরের ভাবমূর্তি ভীষণ ভাবে ক্ষুণ্ণ করবে এই আশংকায় নানা দিক থেকে অনুরোধ আসতে লাগল তিনি যেন অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ না করেন।

প্রায় দেড়ঘণ্টার ভাষণে আম্বেদকর আবেগমথিত কণ্ঠে বলেন, যে গত দেড় দশক ধরে তিনি ও তাঁর সহযোগীরা অস্পৃশ্যদের অর্থনৈতিক, সামাজিক শিক্ষাবিষয়ক ও রাজনৈতিক অধিকারের দাবী প্রতিষ্ঠা করার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম চালিয়েও বর্ণহিন্দু বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের চক্রান্তে কোনো কিছুই আদায় করতে পারেন নি, উল্টে তাঁরা সর্বত্র অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়েছেন। অর্থ ও শক্তি দুয়েরই অপব্যয় হয়েছে বলে তাঁর বিশ্বাস। অতএব এবার সময় হয়েছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার। তাঁরা এই দুঃসহ অবস্থায় থাকতে বাধ্য হচ্ছেন একটি মাত্র কারণে, এবং তা হল তাঁরা হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত বলে। তিনি উপস্থিত জনতার কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন যে ধর্ম তাঁদের প্রত্যেককে সমান মর্যাদা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং আইনগত সমানাধিকার দেবে সেই ধর্ম গ্রহণ করাটা অন্যায় হবে কিনা? তবে জনগণকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন যে অন্য ধর্ম গ্রহণ করার আগে ভাল ভাবে যেন চিন্তা করে নেন যে নতুন ধর্ম তাদের অভীপ্সিত মর্যাদা দেবে কি না।

নিজের ধর্মান্তরিত হবার সম্পর্কে আম্বেদকর বলেছিলেন—তিনি জন্মই নিয়েছেন অস্পৃশ্য হিন্দু হিসাবে, এর অন্যথা করা তাঁর এক্তিয়ারে ছিল না। তবে এটাও ঠিক যে তিনি হিন্দু হিসাবে মরবেন না।

ঐ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সারা ভারতকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল—প্রস্তাবে বলা হয়েছিল অস্পৃশ্যদের প্রতি বর্ণহিন্দুদের অমানবিক ঘৃণ্য আচরণের প্রতিবাদে সংগ্রাম করার আর দরকার নেই। অস্পৃশ্যরা যেন অযথা হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য নিজেদের শক্তি ক্ষয় না করেন।

ইয়োলা সম্মেলনের পর ঐ প্রস্তাবের প্রেক্ষাপটে এক গুরুতর পরিবর্তন এল আম্বেদকরের জীবনে। ধর্মান্তরিতকরণে আগ্রহী ধর্মাবলম্বীদের নেতারা উৎফুল্ল হয়ে উঠল এই ভেবে যে হিন্দুদের মাতৃভূমি ভারতেই এবার হিন্দুদের মৃত্যু ঘণ্টা শোনা যাচ্ছে। ইসলাম ধর্মের নেতারা লোভাতুর হলেন আম্বেদকরকে পাবার জন্য, খৃষ্টান ধর্মের উদ্যোক্তারা আশান্বিত হলেন যে এবার তাঁদের ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বেড়ে যাবে প্রচুর পরিমাণে। শিখ বা বৌদ্ধ ধর্মের নেতারাও অনুরূপ স্বপ্ন দেখতে লাগলেন।

মুসলিম নেতা কে. এল. গোঁড়া টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আম্বেদকরকে জানালেন যে অস্পৃশ্যরা যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তবে সানন্দে তাদের উপযুক্ত সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার দেওয়া হবে।

বোম্বাইয়ের এক গির্জার বিশপ আম্বেদকরের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে আশ্বাস দেন যে অস্পৃশ্যরা যদি খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে তবে তাদের জীবনে নবযুগের সূচনা হবে।

বেনারসের বৌদ্ধদের মহাবোধি সোসাইটি আম্বেদকরকে আমন্ত্রণ জানান বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করার জন্য, কারণ বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করলে অস্পৃশ্যরা মানুষের পূর্ণ মর্যাদা পাবে, যেহেতু বৌদ্ধ ধর্মে জাতপাতের অস্তিত্ব নেই।

পাঞ্জাবের স্বর্ণমন্দির থেকে জানান হয় যে প্রেম ও সাম্যের মন্ত্রে বিশ্বাসী শিখ ধর্মই পারবে নির্যাতিত জনগণের বহুকাঙ্খিত মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে।

এইভাবে সব ধর্মাবলম্বীদের নেতারা যখন ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিলেন অস্পৃশ্যদের উদ্ধার করতে তখন গান্ধীজী প্রমাদ গুনলেন। নিম্নবর্ণের মানুষ যে অকথ্যভাবে নির্যাতিত হচ্ছে একথা মেনে নিয়েও গান্ধীজী বলেন যে, 'কিন্তু ধর্ম তো বাড়ী বা পোষাকের মত নয়, যে ইচ্ছে করলেই পাল্টে নেওয়া যায়।'

অন্তরীণ থাকা অবস্থায় রত্নগিরি থেকে বীর সাভারকরও সতর্ক করে দেন অস্পৃশ্যদের ঐ ধরনের পদক্ষেপ না নিতে, কারণ নতুন

ধর্ম তাদের সমমর্যাদা দেবে কিনা সন্দেহ, এবং উদাহরণ হিসাবে ত্রিবাঙ্কুরে স্পৃশ্য খৃষ্টান ও অস্পৃশ্য খৃষ্টানদের মধ্যে সংঘর্ষের উল্লেখ করেন।

প্রসঙ্গত অবিভক্ত বাংলাদেশের একটা বহুশ্রুত কাহিনীর উল্লেখ না করে থাকা যাচ্ছে না, কাহিনীটি কতদূর সত্য তা বলা যাচ্ছে না। বিখ্যাত বনেদী দত্ত পরিবারের সম্ভাবনাময় সন্তান মধুসূদন দত্ত প্রেমে পড়েন খৃষ্টান রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জীর কন্যার সঙ্গে। মধুসূদন ধর্মান্তরিত হলে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবেন এরূপ একটা প্রলোভন দেখিয়েছিলেন কৃষ্ণমোহন। মধুসূদন মাইকেল মধুসূদন হয়ে আসার পর কৃষ্ণমোহন মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে আপত্তি তোলেন, কারণ ব্রাহ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায় খৃষ্টানের সঙ্গে দত্ত কায়স্থ খৃষ্টানের বিয়ে হয় না।

সাভারকর সমস্যাটিকে অন্য মাত্রা দিলেন এই পরামর্শ দিয়ে যে, যেহেতু ধর্ম যুক্তিতর্কের চেয়ে বিশ্বাসকে প্রাধান্য দেয় বেশি, তাই আম্বেদকরের উচিত হবে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের চেয়ে যে ধর্মে যুক্তি প্রাধান্য পায় সেই ধর্ম গ্রহণ করা, এবং তা না পেলে নিজের বর্ণের লোকেদের টেনে ওপরে তুলতে সংগ্রাম করা।

নানা রকমের প্রতিবাদ আসতে লাগল আম্বেদকরের কাছে। কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইয়োলা সম্মেলনের মূল বক্তব্যকে মেনে নিলেও ধর্মান্তরণ সংক্রান্ত প্রস্তাবটির নিন্দা করলেন। এমন কি বোম্বাই—নাগপুরের নির্যাতিত শ্রেণীর জনগণের নেতারাও আম্বেদকরকে নিষেধ করলেন ঐ প্রস্তাব কার্যকর না করতে।

পরিণাম যাই হোক না কেন আম্বেদকরের ঐ প্রস্তাব ভীমরুলের চাকে যে ঢিল মেরেছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সব পরামর্শ, অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করে ঘোষণা করলেন অন্য ধর্ম গ্রহণ করার ব্যাপারে তিনি মনঃস্থির করে ফেলেছেন, যাঁরা তাঁর সঙ্গে আসতে চান, তাঁরা আসবেন।

গোঁড়া হিন্দুরা প্রসন্ন হলেন পথের কাঁটা সরে যেতে যাচ্ছে

দেখে। অশিক্ষিত অব্রাহ্মণরা এ নিয়ে মাথা ঘামালেন না, ব্যাপারটা ব্রাহ্মণদের নিজস্ব। আবার যে-সব মহারাজারা অস্পৃশ্যদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন, তাঁরা হতাশ হলেন আম্বেদকরের ঐ সিদ্ধান্তে। এক সিন্ধি হিন্দু নিজের রক্ত দিয়ে চিঠি লিখে আম্বেদকরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যদি তিনি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করেন তবে তাঁকে খুন করা হবে।

যাই হোক নিজের সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাব কার্যকর করার বিষয়টি পাঁচ বছর স্থগিত রাখার কথা বললেন আম্বেদকর, এবং সদাশয় হিন্দু নেতারাও জানালেন ঐ সময়ের মধ্যে সমস্যাটি মিটিয়ে ফেলা হবে। এক সময়ে শিখ ধর্ম গ্রহণ করার কথাও তিনি বলেছিলেন।

মনের দিক থেকে যে প্রস্তুতিই আম্বেদকর তখন নিচ্ছিলেন না কেন, কার্যতঃ মাহার সম্মেলন, কৃষক সম্মেলন প্রভৃতির আয়োজন করে সক্রিয়ভাবে অস্পৃশ্যদের ভালোর জন্য কাজ করে চলেছিলেন। এই সময়কার একটি সামান্য ঘটনা আম্বেদকরের চরিত্রের এক অসামান্য দিককে তুলে ধরে। কোলাবা জেলার চারীতে কৃষক সম্মেলন হচ্ছিল। ভিজে মাঠের ওপর খড় বিছিয়ে সবাই বসেছিলেন হঠাৎ একটা বিছে বেরিয়ে পড়ে। অন্যেরা যখন লাঠি বা জুতোর খোঁজ করছিলেন, তখন আম্বেদকর উঠে গিয়ে খালি পায়ের তলায় মাড়িয়ে বিছেটাকে মেরে ফেলেন।

এই সময়ে ল' কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন আম্বেদকর। শুধু পড়ানো নয়, আইনের দুনিয়ায় যে-সব অসঙ্গতি ছিল তার বিরোধীতাও করেন। আইন শিক্ষার সংস্কারও তিনি চেয়েছিলেন। তাছাড়া তখন বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ছ' শ্রেণীর আইনজীবী ছিল, আম্বেদকর বলেন যে শিক্ষাগত যোগ্যতা এক হওয়া সত্ত্বেও উকিলদের মধ্যে এতগুলি শ্রেণী বিভাজন করা ঠিক না।

তবে যত কাজেই ব্যস্ত থাকুক না কেন আম্বেদকর কিন্তু ধর্মান্তরিত হওয়ার সংকল্প থেকে বিচ্যুৎ হচ্ছিলেন না। ১৯৩৬

সালে জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি পুণাতে অনুষ্ঠিত এক সভাতে সভাপতি অধ্যাপক এন. শিবরাজ বলেন, অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবার একটাই পথ হল শুধু হিন্দুধর্ম বর্জন করে অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করে নয়, বরং আর্য্যরা এদেশে নানা প্রথা বিশিষ্ট হিন্দুধর্মের আমদানী করার আগে যে আদি-দ্রাবিড়ীয় প্রথা প্রচলিত ছিল তার আশ্রয় নেওয়া।

এই সম্মেলনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। ডঃ সোলাঙ্কি, যিনি এতদিন আম্বেদকরের ইয়োলা প্রস্তাবের বিরোধীতা করছিলেন, এখানে হঠাৎ তিনি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বললেন অনুন্নত শ্রেণীর জনগণের জন্য কোনো বেদ, গীতা, মুনি, ঋষি বা শংকরাচার্যের দরকার নেই, তারা চায় শুধু আম্বেদকরের নেতৃত্ব।

অন্য ঘটনাটি একটু ভয়ের ছিল, ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রশ্নে চামার সম্প্রদায় আম্বেদকরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করেছিল। ঐ সম্মেলনেই আম্বেদকর উপস্থিত শ্রোতাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, অন্য ধর্ম গ্রহণ করলেই যে আমরা সব কিছু পেয়ে যাবো তা নয়। প্রতিটি দাবী আদায়ের জন্য সংগ্রাম করে যেতে হবে। আর হিন্দুধর্মের ছত্রছায়ায় থাকলে কখনোই অস্পৃশ্যরা সমমর্যাদার দাবীর লড়াই জিততে পারবে না। হিন্দুদের নিশ্চয়ই কোনো গূঢ় স্বার্থ আছে, তা না হলে তারা নিজামের নাম করে সাত কোটি টাকা দলিত সমাজের কল্যাণ সাধনে দিতে কেন চেয়েছিল? গান্ধীজী হরিজনদের জন্য যে অর্থ-তহবিল গড়ে তুলেছেন তা অস্পৃশ্যদের চিরকাল বর্ণহিন্দুদের শিবিরে আটকে রাখার জন্য।

আম্বেদকরের বক্তৃতা মাহার সম্প্রদায়ের কাছে যতটা গ্রহণযোগ্যই হোক না কেন, অনুন্নত শ্রেণীর অন্যান্য গোষ্ঠীগুলি এবং বাইরে থেকে যাঁরা তাঁকে সমর্থন করতেন তাঁরা কেমন যেন নিজেদের গুটিয়ে নিতে শুরু করলেন, কারণ তাঁরা বুঝতে পারছিলেন নিছক

ধর্মান্তরকরণে তাঁদের কোনো লাভ হবে না। বর্ণহিন্দুর যে-সব প্রকৃত অর্থে উদারমনা মানুষ আম্বেদকরকে নিরন্তর সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে যাচ্ছিলেন তাঁরা এইবার বিরক্ত হতে শুরু করলেন আম্বেদকরের একগুঁয়েমিতার জন্য। অনেকে আবার ঐ ঘোষণাকে চমক সৃষ্টিকারী ধাপ্পাবাজী বলতেও দ্বিধা করেন নি, তাঁদের মতে ঐ যুব কথা বলে আম্বেদকর হিন্দুদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।

ঐ সব সম্মেলনের শেষেও কিন্তু ইয়োলা সম্মেলনের প্রস্তাবকে সমর্থন করা হল।

অষ্টম পর্ব

১৯৩৬ সালের গোড়ার দিকে লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য জাত-পাত-তোড়ক মণ্ডলের বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার আমন্ত্রণ পেয়ে সভাপতির ভাষণ তৈরীর কাজে ব্যস্ত রইলেন আম্বেদকর। সম্মেলন হবার কথা ছিল এপ্রিল-মে মাসে।

এদিকে আম্বেদকরের ঘোষণাকে কেন্দ্র করে অনেক ঝড় উঠতে লাগল। এই সময় ১৯৩৬ সালের ১৫ই মার্চ বোম্বে থিয়েটার হলে চিত্তরঞ্জন থিয়োট্রিকাল কোম্পানী আম্বেদকরের সম্মানার্থে এক সভার আয়োজন করে যার প্রধান আকর্ষণ ছিল আপ্পাসাহেব টিপনিসের লেখা একটি নাটকের উপস্থাপনা। নাটকের বিষয়বস্তু ছিল অস্পৃশ্যতা। ইতিহাস আশ্রিত এই নাটকে দেখানো হয়েছিল পেশোয়াদের রাজত্বকালে কীভাবে অস্পৃশ্যদের গলায় মাটির পাত্র বেঁধে রাখতে হত, আর কোমর থেকে ঝুলত লম্বা ঝ্যাঁটা, যা মাটি ঝাঁড় দিতে দিতে চলত তাদের পায়ের ছাপ মুছে দেবার জন্য। আম্বেদকর ঐ নাটক দেখতে আসছেন শুনে প্রেক্ষাগৃহে দর্শক

উপছে পড়েছিল।

আম্বেদকর সভাপতি হচ্ছেন শুনে জাত-পাত তোড়ক মণ্ডলের বেশ কিছু বড় নেতা সরে যেতে চাইলেন, কারণ আম্বেদকর তখন লোকের কাছে হিন্দু-বিদ্বেষী বলে কুখ্যাত হয়ে উঠেছেন। তাই ঐ মণ্ডলের পক্ষ থেকে একজন এসে আম্বেদকরের ভাষণের কপি নিয়ে গেলেন।

এই সময়ে অমৃতসরে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল শিখ মিশন সম্মেলন। ঐ সম্মেলনে শিখরা ছাড়া যোগ দেন পাঞ্জাব, কেরালা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের অনুন্নত শ্রেণীর প্রতিনিধিরা। সভাপতিত্ব করেন অবসর প্রাপ্ত জেলা-জজ সর্দার বাহাদুর হুকুম সিং। আম্বেদকর তাঁর ভাষণে শিখ ধর্মের ঔদার্য এবং সমশ্রেণীভুক্তির এতই প্রশংসা করেন যে বেশ কিছু অনুন্নত শ্রেণীর নেতা তাঁদের অনুগামীদের নিয়ে শিখ ধর্ম গ্রহণ করেন।

শিখদের সঙ্গে আম্বেদকরের এই ঘনিষ্ঠতার দিকটি জাত-পাত-তোড়ক মণ্ডলের অনেকের মনঃপূত হয়নি। তাঁরা সম্মেলনে অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী করে দিলেন এবং বেদ পুরাণ ইত্যাদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে আম্বেদকর যেসব সমালোচনা করেছিলেন তাঁর ঐ সভাপতির ভাষণে সেগুলি বাদ দেওয়ার সুপারিশ করা হল। আম্বেদকর তাঁর ভাষণের কপি ফিরিয়ে নেন যা পরে 'জাতিপ্রথার অবলুপ্তি' নাম দিয়ে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়েছিল।

ইত্যবসরে গান্ধীজীর অনুগামীরা আম্বেদকরের ক্রিয়াকলাপে বেশ বিব্রত বোধ করছিলেন। যমুনালাল বাজাজ এবং শেঠ ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদের মত গান্ধী সমর্থক ধনকুবেররা এ নিয়ে একটা কিছু করার সিদ্ধান্ত নিলেন। শেঠ ওয়ালচাঁদ শেষ পর্যন্ত আম্বেদকরকে রাজী করালেন গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে। প্রথমে ওয়ার্ধা, পরে সেগাঁও-এ (যা পরে সেবাগ্রাম নামে বিখ্যাত হয়েছিল) গান্ধী-আম্বেদকর সাক্ষাৎকার হল। কিন্তু সমস্যার

কোনো সমাধান খুঁজে পাওয়া গেল না। গান্ধীজীর শিবিরে যোগ দিলে আম্বেদকরকে অশাতীত অর্থ সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিও বিফলে গেল। আম্বেদকর তখন বলেছিলেন সাফল্য লাভের জন্য নিজের বিবেককে বলি দিতে আমি পারব না। ফেরার সময় আম্বেদকরকে স্বাগত জানাতে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যে হাজার হাজার অস্পৃশ্য শ্রেণীর মানুষ সমবেত হয়েছিলেন তা দেখে ঐ ধনকুবেররা পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন গান্ধীজীর হরিজনরা এ ভাবে সাড়া দেয় না।

'জাতিপ্রথার অবলুপ্তি' পুস্তিকাটি প্রকাশিত হবার অল্পদিনের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং বহুভারতীয় ভাষায় তার অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল।

এই পুস্তিকাতে আম্বেদকর যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছিলেন যে, বেদ-পুরাণে বর্ণিত চারটি বর্ণের তত্ত্ব কতটা ভ্রান্ত, বিশেষ করে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এবং উচ্চবর্ণের ইচ্ছাকৃত অপব্যাখ্যায়। যার ভিত্তিতে নিম্নশ্রেণীর শূদ্রদের শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত, তাদের অর্থনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ এবং অস্ত্র সঙ্গে রাখার নিষেধাজ্ঞা জারী করে চিরকাল তাদের পদানত করে রাখার চক্রান্ত ছিল। অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করে তাদের বিদ্রোহ করার পথটিও বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। বর্ণাশ্রমে সমাজের শ্রম বিভাজন না করে, শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত করার ব্যবস্থা পাকা করা হয়।

জাত-পাতের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে উন্নত ও সবল বংশধারা সৃষ্টির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছিল। বিবাহ-পদ্ধতি জাত ও বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখার ফলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের পেশাগত গুণাবলীর পারস্পরিক সংমিশ্রণে বাধার সৃষ্টি হয়, যার ফলে উন্নততর প্রজন্ম সৃষ্টি হচ্ছিল না। যেসব ক্ষেত্রে বিবাহের তথাকথিত বিধি-নিষেধ ভঙ্গ করে কেউ দুঃসাহসিক কোনো পদক্ষেপ নিত, সনাতনপন্থী সমাজপতিরা তাদের সমাজ থেকে বহিষ্কার করে দিত। ফলে তাদের সন্তান-সন্ততিরা নিচজাতের সংখ্যা

বৃদ্ধি করতে সাহায্য করত। এ কারণে সামাজিক ঐক্য খণ্ড খণ্ড হয়ে নিজেদেরই আরও দুর্বল করে তুলছিল। যার জন্য বৈদেশিক আক্রমণের কাছে বারবার পরাজিত হতে হয়েছিল হিন্দুদের।

শ্বাশ্বত হিন্দুধর্মের মহৎ গুণগুলি সম্বন্ধে আম্বেদকর যে ওয়াকিবহাল ছিলেন না, একথা সত্য নয়। যে ধর্মভাব মানুষে মানুষে সখ্যতার ও সহধর্মিতার অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে রাখে কুচক্রী ও ক্ষমতালিপ্সু বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ সমাজ তা ছিন্ন করে রাখতে ভালবাসত নিজেদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখতে।

জাতপাতের ব্যবস্থাকে সরল করে আনার জন্য জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে পংক্তি ভোজনের গুরুত্ব আংশিকভাবে মেনে নিলেও তা যে মূল সমস্যার সমাধান করতে পারবে না এটা জানতেন আম্বেদকর। তাই তিনি রক্তের বন্ধনকে দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে অসবর্ণ বিবাহের সুপারিশ করেছিলেন। এর ফলে বর্ণ-বিদ্বেষ নিজের থেকেই দূরীভূত হবে। ভারতের অনেক সমাজ-সংস্কার বুদ্ধিজীবীরাও এই তত্ত্বের পরিপোষক ছিলেন।

কয়েকজন অস্পৃশ্য দলের নেতা অন্য ধর্ম গ্রহণের পরিবর্তে এক নতুন ধর্মের উদ্ভাবনের কথা বলেছিলেন। আম্বেদকরেরও নিজস্ব কিছু মত ছিল এ ব্যাপারে। তাই জনমত যাচাই করার জন্য ১৯৩৬ সালের মে মাসে বোম্বাই শহরের দাদরে এক ধর্ম-সম্মেলনের আহ্বান জানানো হয়। এতে কিছু খৃষ্টান, শিখ ও মুসলিম নেতাদেরও ডাকা হয়েছিল।

ঐ সম্মেলনে আম্বেদকর এক দীর্ঘ লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল—হাজার হাজার বছর ধরে নিম্নবর্ণের মানুষ হিন্দুধর্মের কাঠামোর মধ্যে বন্দী হয়ে আছেন, সংধর্মের নামে তাঁদের ওপর এমন সব বিধিনিষেধ আরোপিত হয়ে আসছে, যার ফলে ধর্মান্তরিত না হলে ঐ বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া সুদূর পরাহত। হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করলে একদিকে যেমন হিন্দুদের কাছ থেকে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু পাবেন না, তেমনি অন্য ধর্ম গ্রহণ

করলে তাঁরা পাবেন অনেক বেশি সামাজিক স্বীকৃতি, মর্যাদা এবং অর্থভাগ্যও ভাল হয়ে যেতে পারে। হিন্দুধর্মের কূটনৈতিক চালে বর্তমানে অস্পৃশ্যরা শুধু সামাজিক বিধিনিষেধের অনুবর্তী হতে বাধ্য হয়েছেন তা নয় সেই সঙ্গে বঞ্চিত হয়েছেন সৈন্য, নৌ এবং পুলিশ বিভাগে চাকরী পাবার অধিকার থেকে।

ক্ষুব্ধ আম্বেদকর বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলেন ঐ ভাষণে—যে ধর্ম সাধারণ মানুষকে হীন ও অস্পৃশ্য বলে তাকে প্রকৃত অর্থে ধর্ম আখ্যা দেওয়া যায় কি না ? যে ধর্ম তার আশ্রিত একটি বড় অংশকে শিক্ষা, ধনসম্পদ উপার্জন এবং অস্ত্রধারণে বাধা দেয়, তাকে ধর্মের বদলে প্রতারণা বলাই কি যুক্তিসঙ্গত হবে না ? যে ধর্ম তার একটা অংশকে চিরকাল শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত করে রাখতে এবং দারিদ্রসীমার নিচে ফেলে রাখতে চায় তাকে ধর্ম না বলে বঞ্চনার ও শোষণের কর্মশালা বলাই কি উচিত হবে না ?

আম্বেদকরের এইসব অকাট্য ও জোরালো যুক্তির তীব্র প্রভাব পড়ে উপস্থিত শ্রোতাদের মনের ওপর এবং মাহার সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই হিন্দুধর্ম ত্যাগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন। এসব খবর প্রচারিত হওয়া মাত্র নানা ধর্মের নেতারা আম্বেদকরকে দলে নেবার চেষ্টা করতে শুরু করেন।

হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে ডঃ মুঞ্জে এসে দেখা করলেন আম্বেদকরের সঙ্গে। আলোচনার পর শিখ ধর্মকে প্রাধান্য দেবার কথা উঠল। শিখরা হিন্দু মহাসভার সদস্য হতে পারতেন। তাছাড়া খৃষ্টান বা ইসলাম ধর্মের বদলে শিখ ধর্ম গ্রহণ করলে অস্পৃশ্যরা প্রায় হিন্দুধর্মের অঙ্গ হয়েই থাকবেন, যেটা তাঁদের পক্ষে অবশ্যই কল্যাণকর হবে। বীর সাভারকর এই প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন এমন কি শিখ ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে শংকরাচার্য ডঃ কুর্ত্তকোটিও অনুমোদন করলেন আম্বেদকরের বক্তব্যকে।

চারদিক থেকে জনসমর্থন আসার ফলে বহু অস্পৃশ্যের মধ্যে ধর্মান্তরিত হবার প্রবণতা বেড়ে গেল। আর এইভাবে যদি অন্ত্যজ

বর্ণের লোকেরা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে তবে ভারতের রাজনীতিতে তার কি কুফল ফলবে এটা বুঝতে পেরে পণ্ডিত নেহেরু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে নেহেরু বলেছিলেন, ভারতের মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান। জাতিধর্মের অত্যাচারে এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা পাবার লোভে দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে খৃষ্টানদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছিল। এর ওপর যদি আম্বেদকর তাঁর লক্ষ লক্ষ অনুগামীদের নিয়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেন তবে ভারতের রাজনৈতিক দিকটিতে সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। এই আশংকার কথা এবার বর্ণহিন্দু ও তাদের নেতারাও উপলব্ধি করতে শুরু করলেন।

নবম পর্ব

শিখ ধর্ম সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জ্ঞানলাভের জন্য বেশ বড় একটি দলকে অমৃতসরে পাঠালেন আম্বেদকর। কারণ অতিব্যস্ততায় কোনো কিছু করা, অন্ততঃ ধর্মান্তরিত হওয়ার মত বিরাট ব্যাপারে, আম্বেদকর যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি। এ ব্যাপারে হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্য তিনি ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিতেও শুরু করলেন।

এদিকে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে পট পরিবর্তনের নান্দী-মুখ শুরু হয়ে গেছে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন কার্যকর করার কথা ঘোষণার সঙ্গে ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষিত হল।

অর্থনীতির সুযোগ্য ছাত্র আম্বেদকর এবার নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। নির্বাচন লড়তে গেলে একটি সংগঠনের প্রয়োজন, তাই তিনি দলীয় সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ইনডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি

নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করলেন।

বেশ কয়েক দফা এক কর্মসূচীও গ্রহণ করল এই পার্টি।

(১) নতুন সংবিধান দায়িত্বশীল সরকার গঠনে পূর্ণমাত্রায় সক্ষম না হলেও তাঁর নবগঠিত দল অংশ গ্রহণ করবে।

(২) কৃষিভিত্তিক দেশ হিসাবে ভারতে কৃষি জমির ক্রমান্বিত বিখণ্ডীকরণ যে কৃষিকর্মের অবনতির কারণ এটা পার্টি মনে করে এবং দেশের প্রধান দারিদ্রের কারণ যে সেটাই একথা অস্বীকার করা যায় না। এর থেকে মুক্তির উপায় হল প্রাচীন শিল্পগুলির পুনর্বাসন ও নতুন শিল্প স্থাপন। শিল্পের জন্য দক্ষ প্রশিক্ষণেরও দাবী জানানো হয় ঐ কর্মসূচীতে। এবং অত্যধিক হারে খাজনা আদায় ও যখন তখন কৃষককে জমি থেকে যাতে জমিদাররা উৎখাত করতে না পারে তার জন্য আইন প্রণয়নের দাবী জানাল এই পার্টি।

(৩) শিল্পকে, বিশেষ করে বৃহৎ শিল্পগুলিকে সরকারী মালিকানাধীন করার কথা বলা হয়েছিল। তার সঙ্গে যুক্ত করা হবে শ্রমিক স্বার্থে আইন প্রণয়ন করা। কাজের নির্দিষ্ট সময়, বেতন, বাসস্থান ও চিকিৎসাদির সুব্যবস্থাও দাবী করা হয়েছিল ঐ কর্মসূচীতে।

(৪) বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য দরকার ভূমি ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস, শিল্প সম্প্রসারণ ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর প্রবর্তন আবশ্যক। নিম্ন মধ্যবিত্তদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাদের অনুকূলে বাড়ী ভাড়া ও উচ্ছেদ ইত্যাদির ব্যাপারে আইন প্রণয়নও ছিল এই কর্মসূচীর অন্যতম অঙ্গ।

(৫) প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে সবার আগে দরকার শিক্ষার মান উন্নত করা, কারণ শিক্ষাই মানুষের শোষণমুক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। তাই সরকারী খরচে প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থার দাবীও সন্নিবেশিত হয়েছিল ঐ কর্মসূচীতে।

(৬) সব কিছুর উর্দ্ধে স্থান পেয়েছিল প্রচলিত সমাজব্যবস্থার

আমূল পরিবর্তন। সাম্য ও মৈত্রীর ভিত্তিতে নতুন শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে হলে প্রথমেই জাত-পাতের নিয়ম ও বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার অবসান ঘটানো আবশ্যক। যে সব সনাতনপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল মানুষ বা গোষ্ঠী এর বিরোধীতা করবে তাদের জন্য উপযুক্ত কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থার দাবী করেছিল আম্বেদকরের এই ইনডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টি।

নির্বাচনের কিছু আগে আম্বেদকর হঠাৎ ইউরোপে চলে যান। অনেকের ধারণা হল নির্যাতিত শ্রেণীর মানুষ যদি শিখ ধর্ম গ্রহণ করে তবে ১৯৩৫-এর আইনে শিখদের যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল সেগুলি তারা পাবে কিনা তা জানার জন্য আম্বেদকরের এই বিদেশ যাত্রা।

১৯৩৭ সালের জানুয়ারী মাসে আম্বেদকর ফিরে এসে নির্বাচনের ব্যাপারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সর্বশক্তি নিয়ে। এই সময় ডেমোক্র্যাটিক স্বরাজ পার্টির ব্রাহ্মণ নেতা এল. বি. ভোপতকর ও শ্রী কেলকরের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা করেন আম্বেদকর। ফলে দলের ভিতর এবং বাইরে থেকে দারুণ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। কিন্তু আম্বেদকর বুঝেছিলেন যে ব্রাহ্মণদের সমর্থন না পেলে ভোটে জেতা সহজ হবে না। তাঁর হিসাবে যে ভুল ছিল না, তার প্রমাণ ভোটের ফলাফল। ১৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৫ জন জয়ী হলেন। তাঁদের মধ্যে আম্বেদকর অন্যতম।

এই সাফল্যের সঙ্গে আর একটা পুরস্কার পেলেন আম্বেদকর, চৌদার পুকুরের মামলার রায় তাঁদেরই অনুকূলে গেল।

বেগতিক বুঝে এবার কংগ্রেস চাইল আম্বেদকরের সঙ্গে আঁতাত করতে। কিন্তু তিনি তা সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯৩৭ সালের আগস্ট মাসে বোম্বাই বিধানসভায় মন্ত্রীদের বেতন সংক্রান্ত বিলটি পেশ হয়, তাতে মন্ত্রীদের বেতনহার ধার্য করা হয় মাসিক ৫০০ টাকা হিসাবে। এই বিলের প্রচণ্ড বিরোধীতা করে আম্বেদকর বলেন যে, দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক

মানদণ্ড অনুসারে মন্ত্রীদের বেতন ৭৫ টাকার বেশি হওয়া উচিত নয়।

এই সময় তিনি কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট পার্টি উভয়ের সমালোচনা করতে থাকেন তীব্রভাবে। ১৭ই সেপ্টেম্বর বোম্বাই আইনসভার পুণা অধিবেশনে দরিদ্র ক্ষেত মজুরদের শোষণ করা 'কোঠী ব্যবস্থা' অর্থাৎ জমি ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্হা রদ করার জন্য একটি বিল পেশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকায় তা উত্থাপন করতে দেওয়া হয়নি। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, সমগ্র ভারতবর্ষের প্রদেশের আইনসভাগুলিতে ক্ষেত মজুরদের স্বার্থে প্রথম বিল আনতে চেয়েছিলেন এই আম্বেদকরই। 'কোঠি ব্যবস্হা' রদ করার জন্য বিলটি আইনসভায় উত্থাপন করতে না দেওয়াতে আম্বেদকর গণ আন্দোলনের আশ্রয় নিলেন। নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এই আন্দোলন। নাম করা নেতাদের সঙ্গে নিয়ে বিশাল মিছিল করে আম্বেদকররা দেখা করলেন বোম্বাইয়ের প্রধানমন্ত্রী (তখন মুখ্যমন্ত্রী শব্দটি চালু হয় নি) খের-এর কাছে। তাঁর কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া না পেয়ে বিরাট সভা করেন ওখানকার এসপ্লানেড এলাকায়। সেখানে শোষক ও শোষিতদের স্বরূপ বর্ণনা করে তিনি আহ্বান জানান শ্রমিক-কৃষকদের নেতৃত্বের ভার নিতে।

এর পর তিনি ঝড়ের মত একের পর এক সম্মেলনে যোগ দিতে শুরু করেন এবং সর্বত্র দলিত সমাজের সমস্যা ও তার সমাধানের দাবী জানাতে লাগলেন। আইনসভায় কংগ্রেসের সঙ্গে আম্বেদকরের লেবার পার্টির বিরোধ প্রকট হয়ে উঠছিল ক্রমাগত।

আহমেদ নগরে কৃষক সম্মেলন, মানমদে অস্পৃশ্য রেলকর্মীদের সম্মেলনে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন যে দেশের দরিদ্র শ্রমিকদের প্রধান শত্রু দুটি—পুঁজিবাদ ও ব্রহ্মণ্যবাদ। অস্পৃশ্য রেলকর্মীদের কী ভাবে ভৃত্য হিসাবে ব্যবহার করা হত, পদোন্নতি করা হত না তাও তথ্য সহযোগে তুলে ধরেন সবার সামনে।

শ্রমিক নেতা হিসাবে তিনি দেখেছিলেন যে ট্রেড ইউনিয়ানগুলি

নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে যত উৎসাহী হত, তার চেয়ে অনেক কম সক্রিয় হত মালিকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। শ্রমিক নেতাদের চরিত্র সম্বন্ধেও তাঁর সমালোচনা ছিল তীব্র। পার্টির সাংগঠনিক কাজে বেশি সময় দেবার জন্য ১৯৩৮ সালে আম্বেদকর ল' কলেজের চাকরী ছেড়ে দিলেন। এই সময়ে একটা বিচিত্র ঘটনা অস্পৃশ্যদের সম্বন্ধে গান্ধীজী ও আম্বেদকরের মতদ্বৈধতার বিষয়টি পাদপীঠে চলে এল। মধ্যপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রী ডঃ খারে তাঁর মন্ত্রীসভায় নিতে চাইলেন একজন তফসিলী জাতির প্রতিনিধিকে। জাতীয় কংগ্রেস তাঁর এই প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়ায় ডঃ খারে পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। গান্ধীজীও তাঁকে সমর্থন না করে, উল্টে বললেন হরিজন মন্ত্রীর প্রয়োজন নেই। এর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী কংগ্রেস তখন গান্ধীজীকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও কংগ্রেসী সরকার গঠিত হয়েছিল, সেসব জায়গাতেও কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রটি ক্রমশঃ প্রকট হয়ে উঠতে লাগল। ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাই-এর কংগ্রেসী সরকার তীব্র বিরোধীতা হওয়া সত্ত্বেও 'ইনডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট' নামক বিলটি পাশ করিয়ে নেয়, যার ফলে শ্রমিক স্বার্থ, বিশেষ করে ধর্মঘট করার শ্রমিকের সহজাত অধিকার খর্ব হল।

এই কালা কানুনের বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের শ্রমিক সংস্থাগুলি ৭ই নভেম্বর একদিনের ধর্মঘটের ডাক দেয়। প্রায় ৮০ হাজার শ্রমিক সব রকম প্রতিরোধ উপেক্ষা করে মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ভাবে ধর্মঘট সফল করেন। কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটায় পুলিশ গুলি ও লাঠি চালায়। এই ধর্মঘট সবচেয়ে বেশি সাফল্য এনে দিল আম্বেদকরের লেবার পার্টিকে।

ক্রমশঃ ভারতের রাজনীতির ভাগ্যাকাশে নতুন সূর্যের উদয় হবার পূর্ব লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করেছে।

১৯৩৯ সালের প্রথমদিকে লণ্ডন থেকে ফিরে ভাইসরয়

লিনলিথগো ঘোষণা করলেন যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা। এতে ভারতের করদ রাজ্যগুলি যোগ দিলেও তাদের আলাদা কোনো দায়িত্বশীল সরকার থাকবে না। মনোনয়নের ভিত্তিতে রাজ্যগুলি তাঁদের প্রতিনিধি পাঠাবে কেন্দ্রে। সেই সময় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি এই প্রস্তাব মানতে রাজী হলেন না। মুসলিমলীগও আপত্তি জানায় কিন্তু হিন্দু মহাসভা স্বাগত জানাল ঐ প্রস্তাবকে। আম্বেদকর জোরালো যুক্তি দিয়ে ভাইসরয়ের প্রস্তাবকে নাকচ করলেন।

এদিকে জাতীয় কংগ্রেসে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গিয়েছিল। ত্রিপুরা কংগ্রেসে গান্ধীজীর মনোনীত সদস্যকে হারিয়ে সুভাষচন্দ্র সভাপতি মনোনীত হওয়া গান্ধীজী প্রকাশ্যে বলে ফেলেন সীতারামাইয়ার পরাজয়, আমার পরাজয়। ক্ষোভ প্রকাশ করলেন সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে।

এর মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এই দুর্দিনে বৃটিশ সরকারের ওপর কূটনৈতিক চাপ দেওয়া ঠিক হবে না মনে করে কংগ্রেস নিঃশর্ত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল যুদ্ধের ব্যাপারে। মুসলিমলীগ নেতা কায়েদে আজম জিন্না ঘোষণা করলেন বৃটিশ সরকার যদি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানকে স্বীকৃতি দেবার প্রতিশ্রুতি দেন তবেই তাঁরা বৃটিশকে সাহায্য করবেন। শর্তাধীনে সাহায্য করতে চাইলেন আম্বেদকর; শর্তটি এই—যুদ্ধের পর ভারতকে স্বাধীনতা দিতে হবে এবং বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থেকে, বৃটিশ সহযোগিতায় ভারত নিজের উন্নতিবিধান করবে।

কয়েকমাস পরে কংগ্রেস এক নতুন কথা বলল। ভারতের প্রতি বৃটিশ সরকার যদি নিজেদের মনোভাব সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়, তবেই কংগ্রেস সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। কিন্তু সাভারকর, আম্বেদকর প্রমুখ নেতারা প্রতিবাদে বললেন কংগ্রেস একা এই ধরনের প্রতিশ্রুতি দেবার অধিকারী নয়। ভারতের সব শ্রেণীর প্রতিনিধিদের মতামত নিতে হবে। ফলে অক্টোবর মাসে

ভাইসরয় ৫২ জন ভারতীয় নেতার সঙ্গে আলোচনায় বলেন, এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, গান্ধীজী, জিন্না, নেহেরু, বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সাভারকর, সুভাষচন্দ্র ও আম্বেদকর। ভাই-সরয় লর্ড লিনলিথগো আলোচনান্তে ঘোষণা করলেন সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার পরই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গৃহীত হবে। ইত্যবসরে সব শ্রেণীর প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠন করা হোক একটি ওয়ার্কিং কমিটি। অসন্তুষ্ট কংগ্রেস নেতারা সব প্রদেশ থেকে তাদের মন্ত্রীসভা প্রত্যাহার করে নেবার হুমকী দেয়। এই সময় নেহেরু ব্যক্তিগতভাবে বোম্বাই এসে আম্বেদকরের সঙ্গে বৈঠক করেন। কিন্তু কোনো সুগম পথ খুঁজে বের করা যায় নি।

১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসে কংগ্রেস তাদের হুমকীকে বাস্তবে রূপায়িত করে সব প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাগুলিকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দিল। জিন্না ও আম্বেদকর এই ঘোষণায় খুবই খুশি হন। এমন কি বোম্বাইয়ের এক জনসভায় 'মুক্তিদিবস' পালন উপলক্ষ্যে এই দুই উল্লসিত নেতা পরস্পরের করমর্দন করেন।

এইভাবে গান্ধীজী আশ্রিত কংগ্রেসের ক্ষমতা যত বিপন্ন হতে লাগল, জিন্না তত বেশি উৎসাহিত হতে হতে ১৯৪০ সালের ২৬শে মার্চ লাহোর সম্মেলনে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলি নিয়ে স্বাধীন পাকিস্থান গঠনের দাবী করে বসলেন। পরের মাসে রামগড় কংগ্রেসে জাতীয় কংগ্রেস ভারত বিভাজনের তীব্র প্রতিবাদ জানালো। অনেকে জিন্নার এই দ্বিজাতিতত্ত্বের দাবীর পিছনে গান্ধীজীর নীতিকে দায়ী করেন।

কিছু সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা এই সংকটকালে গান্ধীজীর নেতৃত্বকে এড়িয়ে গিয়ে যুদ্ধে বৃটিশ সরকারকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসলেন কেন্দ্রে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক জাতীয় সরকার গঠনের শর্তে। জিন্না এর প্রতিবাদ করলেন। ভাইসরয়ের বিকল্প প্রস্তাব কংগ্রেসের মনঃপূত হল না।

যখন এই ধরনের বিশৃঙ্খলা চলছে, তখন পথের সন্ধানে

সুভাষচন্দ্র বোম্বাইতে এসে সাভারকর, জিন্না ও আম্বেদকরের সঙ্গে দেখা করেন। আলোচনা চলাকালে আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের ব্যাপারে নেতাজীর মতামত জানতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সুস্পষ্টভাবে নিজের অভিমত জানান নি সুভাষচন্দ্র। ঐ আলোচনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। সাভারকর ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে ব্যক্তিগত কিছু আলোচনার পর সুভাষচন্দ্র দেশের বাইরে গিয়ে সেখান থেকে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করার পরিকল্পনা নেন।

গত্যন্তর না দেখে কংগ্রেসী নেতারা আবার গান্ধীজীর দ্বারস্থ হলেন, তারপরই শুরু হল গান্ধীজীর আইন-অমান্য আন্দোলন।

এটা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে, জিন্না তাঁর দাবী আদায় করতে চলেছেন। দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রভাব কিভাবে কতটা পড়বে এই সব নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে আম্বেদকর ১৯৪০ সালের শেষের দিকে 'থট্‌সঅন পাকিস্থান' নামে একটি গ্রন্থ লেখেন। বিতর্কের ঝড় বয়ে গেল সারা দেশে।

ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জাতীয় চরিত্র বিশ্লেষণ করে আম্বেদকর দেখান যে, মুসলমানরা রাজনীতির চেয়ে ধর্মে বেশি আগ্রহী, তাদের মন বিশ্লেষণধর্মী নয়, আবেগধর্মী। তারা সংস্কারপন্থী নয়, সনাতনপন্থী। তাই দুটি ভিন্ন শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও মানসিকতাবিশিষ্ট জাতিদের নিয়ে অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমানদের নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা যুক্তিযুক্ত হবে না। অতএব সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে অঞ্চল ভাগ করে নেওয়াটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। জিন্নাও বলেছিলেন লোক-বিনিময়ের মাধ্যমেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হবে। গান্ধীজী অবিভক্ত ভারত চাইছিলেন, সেখানে হিন্দু-মুসলমান ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখে শান্তিতে থাকবে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিল। গান্ধীজী পাকিস্থান মেনে নিলেন নেহেরু ও সর্দার প্যাটেলের চাপাচাপিতে। কিন্তু একটা কাজ করলেন অযৌক্তিক ভাবে, লোক-বিনিময়ের তত্ত্বটির বাস্তবতাকে মেনে নিতে অস্বীকার করলেন।

যার বিষময় ফল আজও আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে।

জিন্নার পাকিস্থান দাবীর ফলে কোনো গ্রহণযোগ্য সূত্র পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন আবার ঐ অভিজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা আম্বেদকর এগিয়ে এসে একটা পরিকল্পনা পেশ করলেন। মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলিতে দুই দফা গণভোটের মাধ্যমে স্থির করা হবে কারা পাকিস্থান চায়, আর কারা চায় না। তারপর ঐ প্রদেশগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ও সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলমানদের জন্য সীমানা কমিশন তৈরী করে জেলাওয়ারি ভাগাভাগি করা হবে। তারপর মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সেই জেলাগুলি নিয়ে পাকিস্থান রাষ্ট্র হোক। আম্বেদকরের এই সূত্র ঠিক সময়মত প্রকাশ্যে না এলে আজকের পশ্চিমবঙ্গ ও পাঞ্জাবের অর্দ্ধাংশ আমাদের থাকত না। অন্ততঃ এর জন্যও আমাদের উচিত আম্বেদকরের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা।

দশম পর্ব

আম্বেদকরের বহুমুখী কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটি বিষয় কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্ব পেত, এবং তা হল দলিত সমাজের অর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠা। তিনি এটাও জানতেন যে আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি না হলে দলিতরা যে তিমিরে আছে সেই তিমিরেই থেকে যাবে চিরকাল। বিশেষতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য চাকরীর সঙ্গে সামরিক বিভাগে মাহারদের চাকরী দেবার দাবী তুললেন তিনি।

১৯৪১ সালের জুলাই মাসে ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো দুটি সংস্থা গঠন করলেন। একটি এক্জিকিউটিভ কাউন্সিল, অন্যটি ডিফেন্স অ্যাডভাইজারি কমিটি। শেষোক্ত কমিটিতে দলিত সমাজের পক্ষ থেকে আম্বেদকর ইত্যাদিদের নেওয়া হয়। কিন্তু এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলে দলিত সমাজ বা শিখদের কাউকে না

নেওয়াতে প্রতিবাদ জানালেন আম্বেদকররা।

পর পর ডাকা দুটি সম্মেলনে বৃটিশ সরকারের কাছে দাবী জানানো হয় কাউন্সিলে তাঁদের প্রতিনিধি নেবার জন্য। এই সম্মেলনে কেন বৃটিশ সরকারকে যুদ্ধের ব্যাপারে সাহায্য করা উচিত তা ব্যাখ্যা করে আম্বেদকর বলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হচ্ছে গণতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে ফ্যাসীবাদী শিবিরের। এতে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ভারতবাসীদের উচিত মিত্রপক্ষকে সমর্থন করা।

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ভারতে এলেন এখানকার রাজনৈতিক অচলাবস্থার সমাধান করতে। তিনি সরাসরি প্রস্তাব দিলেন যে, যদি ভারতবাসী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করে তবে যুদ্ধ শেষ হবার তিন বছরের মধ্যে ভারতকে দেওয়া হবে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন এবং শান্তি স্থাপিত হলেই গঠন করা হবে গণপরিষদ।

ভারতের কোনো দলই ক্রিপসের এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন না। আলোচনার সময় কূটকৌশলী ক্রিপস প্রশ্ন করেছিলেন আম্বেদকরকে যে তিনি কোন্ পরিচয়ে আলোচনা সভায় যোগ দিয়েছেন—লেবার পার্টির নেতা হিসাবে, না, দলিত সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে। এই প্রশ্নটি আম্বেদকরকে ঠেলে দিল এক নতুন আবর্তে। তফসিলী জাতির বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ এবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে আম্বেদকরকে সমর্থন করতে এগিয়ে এলেন। দলিত শ্রেণীর মনোবল ও শক্তি বহুগুণ বেড়ে গেল।

আম্বেদকরের পঞ্চাশতম জন্মদিনে, অর্থাৎ ১৯৪২ সালের ১৪ই এপ্রিল যে বিরাট সভার আয়োজন হয়েছিল তাতে সকলে সব বিভেদ ভুলে গিয়ে আম্বেদকরকে প্রাধান্য দিলেন সবার ওপরে।

এর পরে আর একটা যুগান্তকারী ঘটনা ঘটল। একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা বাড়ল এবং আম্বেদকরকে মনোনীত করা হল অন্যতম সদস্য হিসাবে। সেই প্রথম ভারতের ইতিহাসে ভারত সরকারের প্রশাসনিক ব্যাপারে এক দলিত নেতা অংশ নিলেন।

সারা ভারতের দলিত সমাজ এই ঘটনায় উল্লসিত হয়ে ঐক্যবদ্ধতার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করল, এবং প্রতিটি দল-উপদল নিজেদের স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিল সারা ভারত তফসিলী জাতি সঙ্ঘ গঠনের। নিজেদের সব রকম দাবী আদায়ের জন্য এই সঙ্ঘ ঐক্যবদ্ধ ভাবে সংগ্রাম চালাবার দায়িত্বভার গ্রহণ করল।

এই সময়ে আরও একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। নাগপুরের সম্মেলন চলাকালীন ঐ মণ্ডপেই আরও দুটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী সুলোচনাবাই ডোঙ্গরের নেতৃত্বে তফসিলী মহিলা সম্মেলন এবং সর্দার গোপাল সিং-এর সভাপতিত্বে 'মমতা সৈনিক দল'-এর সম্মেলন। মহিলাদের জাগ্রত হতে দেখে আম্বেদকর উদ্বুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন—মহিলারা সক্রিয় ভূমিকা না নিলে কোনো সমাজই উন্নত হতে পারে না। অতএব শিশুদের শিক্ষা, তাদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্খা জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব মাতৃজাতিকে নিতে হবে। বাল্যবিবাহ বন্ধ করা ও অধিক সন্তান হতে না দেওয়ার ব্যাপারে নারীদেরই অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া উচিত।

তফসিলী জাতিসঙ্ঘের নেতৃত্ব করে অপরিহার্যভাবে এসে পড়ল আম্বেদকরের কাঁধে। গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলন যে আদতে দলিত সমাজের সঠিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে এবং করবে এটা বুঝতে পেরে আম্বেদকর জোর প্রচার চালাতে লাগলেন গান্ধীজী তথা কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে। তিনি বলতেন যে সমাজের সবশ্রেণীর যুগপৎ উন্নতি না হলে ও সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হলে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়ে তেমন কোনো লাভ হবে না।

আর এই সত্যটিকে ব্যাপকভাবে প্রচার করার জন্য আম্বেদকর ভারতের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে সভাসমিতিতে যোগ দিতে শুরু করলেন। ১৯৪৩ সালের ১৯শে জানুয়ারী পুণাতে দেশবরেণ্য নেতা এম. জি. রাণাড়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় জাতীয় জীবনে হিংসা ও অহিংসার প্রয়োগপদ্ধতি সম্পর্কে এক

বিচিত্র তত্ত্ব তুলে ধরলেন। তাঁর মতে অবিচার, অত্যাচার, শোষণ ও ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে প্রবল ঘৃণা না জন্মালে কেউ কখনো সমাজ সংস্কার বা জনহিতকর কাজের সঙ্গে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে জড়াতে পারে না। গান্ধীজীর আদর্শায়িত অহিংসার সঙ্গে আম্বেদকরের অহিংসার পার্থক্য এই যে, গান্ধীজীর ক্ষেত্রে যেটা প্রতিষ্ঠিত থাকবে সহনশীলতার ওপর, প্রত্যাঘাত চলবে না, আম্বেদকর সেখানে বললেন জাতীয় জীবনের সাধ্য হবে অহিংসা; কিন্তু সাধন হবে হিংসা।

১৯৪২ সালে আগস্ট মাসে গান্ধীজীর ডাকা 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলন করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে বলা সত্ত্বেও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। বেশির ভাগ কংগ্রেসী নেতা তখন জেলে। তখনই নতুন করে কংগ্রেসের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করার জন্য ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ২১ দিনের অনশন শুরু করলেন গান্ধীজী। কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ আবার চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন আম্বেদকরের ওপর। কিন্তু নিজ আদর্শে অটল রইলেন দলিতদের ঐ মুকুটহীন রাজা।

কেন্দ্রের শ্রমমন্ত্রী হিসাবে আম্বেদকর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেন শ্রমিকদের স্বার্থে। যেমন 'জয়েণ্ট লেবার ম্যানেজমেণ্ট কমিটি' গঠন করা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকদের চাকরী পাবার জন্য 'এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ' স্থাপন করা। শ্রমিকদের বেতন, শিক্ষা, বাসস্থান, সবেতন ছুটি ইত্যাদির প্রচলন এই সময়েই করা হয়। তার সঙ্গে তাঁর মুখ্য দাবী তো ছিলই—তফসিলীদের সরকারী চাকরী দেওয়া।

বৃটিশ সরকারকে এক 'ত্রিপাক্ষিক চুক্তির' সূত্র দিলেন আম্বেদকর—ভারতকে স্বাধীনতা দেবার সময় কংগ্রেস, মুসলিম-লীগ ও তফসিলীদের সংগঠনটিকে নিয়ে পরামর্শ করার পর যা করণীয় তা যেন করে। আর নিজেদের গুরুত্ব বাড়াবার জন্য তিনি সারা দেশে ঘুরে ঘুরে জনমত তৈরী করা শুরু করলেন, আর তারই

পাশাপাশি চলল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণ দলিত সমাজের জন্য প্রকৃত অর্থে কিছু না করার ব্যাপারে। এই সময় 'কংগ্রেস এবং গান্ধী অস্পৃশ্যদের জন্য কি করেছেন ?' শীর্ষক একটি গ্রন্থ লিখে হৈচৈ ফেলে দিলেন সারা দেশে। ঐ গ্রন্থে তিনি তথ্য পেশ করে দেখান কংগ্রেস ও গান্ধীজী ১৯১৭ সাল থেকে হরিজন আন্দোলন শুরু করলেও আসলে কিছুই করেন নি। এমন অভিযোগও আনা হয়েছে গ্রন্থটিতে যে গান্ধীজী তাঁর রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মকে আফিমের মতো নিরক্ষর অস্পৃশ্যদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন।

১৯৪৫ সালে জুলাই মাসে বৃটেনে সাধারণ নির্বাচন হয়। টোরীদলকে পরাস্ত করে লেবার পার্টি জয়লাভ করল। ফলে ভারত সম্পর্কে বৃটিশ সংসদের নীতির ক্ষেত্রে প্রভূত পরিবর্তন এল। ঘোষণা করা হল, ভারতে ১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে সাধারণ নির্বাচন হবে।

বৃটিশ পার্লামেন্টের দেওয়া এই টোপ সব দলকেই বিভ্রান্ত করল। আন্দোলন শিকেয় তুলে তাঁরা মাঠে নেমে পড়লেন ভোট জেতার যুদ্ধে। এক একটা জনচিত্তকারী স্লোগান নিয়ে বড় বড় দল আসরে নেমে পড়ল। আম্বেদকরদের পার্টি অর্থাৎ ফেডারেশনের পর্যাপ্ত অর্থ নেই, সংগঠনও তেমন শক্তিশালী সাধন যন্ত্র পায় নি। হতোদ্যম না হয়ে তিনিও যুদ্ধ চালাতে মনস্থ করলেন, নির্বাচনী সভায় তিনি বললেন—নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা পেলেই অস্পৃশ্যরা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। নানা সভা-সম্মেলনে আম্বেদকর শ্রমিক স্বার্থে অনেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বললেন, তার মধ্যে আঞ্চলিক শ্রম কমিশনারদের সভায় শিল্পে অশান্তি দূরীকরণের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব দেন—প্রথমতঃ শান্তি কমিটি গঠন, দ্বিতীয়ত শিল্প-বিরোধ আইনের সংশোধন এবং শেষতঃ 'সর্বনিম্ন বেতন আইন' প্রণয়ন করা।

নির্বাচনে কিন্তু ভরাডুবি হল হিন্দু মহাসভা ও আম্বেদকরের ফেডারেশনের। বেশির ভাগ সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেস জিতলো অ-তফসিলীদের ভোটের জোরে। মুসলিমলীগ কিন্তু ভাল ফল করল।

নির্বাচনের পর ১৯৪৬ সালের ২৪শে মার্চ ইংল্যাণ্ড থেকে স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস, এ. ভি. আলেকজাণ্ডার ও ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্সকে নিয়ে গঠিত এক ক্যাবিনেট মিশন পাঠানো হল। সব দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন ঐ প্রতিনিধিরা, কিন্তু অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবী মেনে নিলেন না।

১৯৪৬ সালের মে মাসে প্রদত্ত রায়ে ক্যাবিনেট মিশন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের দাবী মেনে নেয় এবং তিন শ্রেণীর প্রদেশ গঠনের সুপারিশ করে। আম্বেদকরদের কোনো উল্লেখ ছিল না ঐ রায়ে। ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল এটাও ঘোষণা করলেন যে অনতিবিলম্বে তিনি মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিয়ে নির্বাচনে বিজয়ী দলগুলির সদস্যদের নিয়ে মধ্যবর্তী সরকার গঠন করা হবে।

প্রথম বোম্বাইতে এসে যে চাওলে অর্থাৎ বস্তি এলাকায় তাঁরা উঠেছিলেন সেখানকার বেশির ভাগ অধিবাসী ছিল দরিদ্র শ্রমিক। ফলে শ্রমিকদের করুণ অবস্থার সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন আম্বেদকর।

সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত শ্রম মন্ত্রী থাকাকালীন শ্রমিক কল্যাণের জন্য যে-সব কাজ করে গেছেন, বিল পাশ করিয়েছেন তার জন্য আজকের শ্রমিকদেরও উচিত আম্বেদকরের কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকা। ন্যূনতম মজুরী বিল, একই কাজের জন্য নারী-পুরুষের সমহারে বেতন, মেটারনিটি লীভ ৮ ঘণ্টা কাজের সময় নির্দ্ধারণ ইত্যাদি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়েছিল আম্বেদকরেরই প্রচেষ্টায়। এই প্রথম ধনী মিল মালিকরা দেখলেন শ্রমমন্ত্রী আক্ষরিক অর্থে শ্রমিকেরই কল্যাণ চাইছেন।

একাদশ পর্ব

ক্যাবিনেট মিশনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসীরা উল্লসিত হয়ে উঠলেন এবং কংগ্রেস দলের গুণ্ডাশ্রেণীর মানুষেরা তফসিলীদের সংগঠন ফেডারেশনের কর্মীদের ওপর হামলা শুরু করে দেয়। এমন কি বোম্বাইতে আম্বেদকরের 'ভারতভূষণ প্রিন্টিং প্রেস'টি পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেয়। ফলে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামা ছাড়া আম্বেদকরদের আর গত্যন্তর রইল না।

১৯৪৬ সালের জুন মাসে একজিকিউটিভ কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিল একটি 'কেয়ার-টেকার' সরকার গঠনের। সেই সময়ে বোম্বাইতে অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মিটিং চলছিল। ফেডারেশন সদস্যরা সেখানে কালো পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন। তফসিলীদের প্রতি ক্যাবিনেট মিশনের অবিচারের বিরুদ্ধে পুণাতে, ওয়ার্ধাতে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু হল।

এর ফাঁকে জ্ঞান তপস্বী আম্বেদকর দেশে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে একটি সংগঠন গঠন করলেন, নাম—পিপল্স এডুকেশন সোসাইটি। তার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য একটি কলেজ স্থাপন করার কাজও শুরু হয়। আম্বেদকর ঐ কলেজটির নাম দিয়েছিলেন সিদ্ধার্থ কলেজ।

কংগ্রেসীদের সভা-সমিতির সামনে ক্রমাগত গণবিক্ষোভ চলার ফলে বিব্রত কংগ্রেসী নেতারা আম্বেদকরের সঙ্গে সিদ্ধার্থ কলেজে দেখা করলেন। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হল না।

প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের ভোটে গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচনের কাজ শুরু হবার মুখে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে যেভাবেই হোক গণপরিষদে আম্বেদকরকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। বোম্বাই আইনপরিষদে ফেডারেশনের সদস্য-

সংখ্যা এমন ছিল না যে আম্বেদকর জিততে পারেন। তখন তফসিলী ফেডারেশনের জনবরেণ্য নেতা বঙ্গসন্তান যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের আমন্ত্রণে আম্বেদকর অবিভক্ত বঙ্গদেশ থেকে তাঁর 'মনোনয়ন পত্র' দাখিল করলেন। মনোনয়ন পত্রে সমর্থক হিসাবে স্বাক্ষর করলেন রংপুরের নির্দল প্রার্থী নগেন্দ্র নারায়ণ রায়। বঙ্গদেশের তৎকালীন অন্যতম তফসিলী নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী মুকুন্দবিহারী মল্লিক নিজে আগ্রহী ছিলেন গণপরিষদের প্রার্থী হবার ব্যাপারে। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল তৎকালীন বহু গণ্যমান্য সদস্যদের সহায়তায় মুকুন্দবিহারী মল্লিককে নিরস্ত করে আম্বেদকরকে জয়ী করাতে উদ্যোগী হন। প্রবীণ নেতা দ্বারিকানাথ বারুরী, গয়ানাথ বিশ্বাস, ক্ষেত্রনাথ সিংহ এবং এমন কি মুকুন্দবিহারী মল্লিকও শেষ পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করলেন আম্বেদকরের জন্য।

যে-সব নবীন কর্মীরা এই ব্যাপারে অতি-সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন তার মধ্যে শ্রী অপূর্বলাল মজুমদার, সন্তোষ কুমার মল্লিক, যোগেন্দ্রনাথ হালদার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। মহিলারাও পিছিয়ে থাকেন নি—সন্তোষকুমারী তালুকদার, বীণা সমাদ্দার, ডঃ স্বর্ণলতা হাজরা ইত্যাদির নাম দলিতদের সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

১৯৪৬ সালের ২৪শে আগস্ট অন্তর্বর্তী মন্ত্রীসভার সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হল কংগ্রেসের তরফ থেকে ছিলেন নেহেরু, সর্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ, রাজা গোপালাচারী, শরৎচন্দ্র বসু ও জগজীবন রাম—এঁদের মন্ত্রী করার কথা হয়। মুসলিমলীগ বিরত থাকে মন্ত্রীসভার সদস্য হবার ব্যাপারে।

অন্তর্বর্তী মন্ত্রীসভার সদস্যদের নাম ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে আম্বেদকর প্রতিবাদ জানান যে, মন্ত্রীসভায় মাত্র একজন তফসিলী সদস্য থাকাটা সমগ্র তফসিলী সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করার নামান্তর মাত্র। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে আর একজন তফসিলী সদস্য নেবার দাবী পেশ করলেন তিনি। জগজীবন রামও সমর্থন করলেন

আম্বেদকরকে। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে তফসিলী ফেডারেশন নাগপুরে সত্যাগ্রহের ডাক দিলেন।

এ নিয়ে ব্যক্তিগত প্রভাব খাটাবার জন্য আম্বেদকর চলে গেলেন ইংল্যান্ডে ওখানকার ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির নেতাদের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে। সেখানে ভারতের দলিত সমাজের প্রতি ইংল্যান্ডের লেবার পার্টির প্রতিকূল মনোভাবের জন্য তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিলেন—মধ্যবর্তী সরকারের কথা ঘোষিত হবার ফলে ভারত জুড়ে শুরু হয়ে গেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। অতএব এখনই ভারতে যেন যুক্তরাষ্ট্র সরকার গঠন করতে দেওয়া না হয়।

আম্বেদকরের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য ভারতে তখন ষড়যন্ত্র চলছিল জোর কদমে। মুসলিমলীগ মত পরিবর্তন করে যোগ দিল ঐ মন্ত্রীসভায় এবং আম্বেদকরের সবচেয়ে বড় সমর্থক যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে লীগের প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করল আইনমন্ত্রীর পদের জন্য। যেহেতু শ্রী মণ্ডল ছিলেন তফসিলী ফেডারেশনের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, তাই ঐ সম্প্রদায়ের তরফ থেকে আর কোনো সদস্যের মন্ত্রীত্বের দাবী বস্তুতঃ খারিজ হয়ে গেল। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বাবু জগজীবন রামকেও লীগের পক্ষ থেকে শ্রী মণ্ডলকে মন্ত্রীসভায় মনোনীত করে আম্বেদকরের রাজনৈতিক সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দেওয়া হল।

সব্যসাচী আম্বেদকর এবার লেখনী ধরলেন তাঁর সংগ্রামকে আরও জোরদার করার জন্য। 'কারা ছিল শূদ্র?' শীর্ষক এক গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখে তিনি দেখালেন মূলতঃ শূদ্ররা ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশজ। ব্রাহ্মণদের চক্রান্তে তাদের একাংশকে সমাজচ্যুত করে শূদ্রবর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল।

অন্তর্বর্তী মন্ত্রীসভায় মুসলিম যোগ দিলেও গণপরিষদে তারা যোগ দিল না। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় জহরলাল নেহেরু ভারতের নতুন সংবিধান সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করার সময় বলেছিলেন যে ভারতকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে

পরিণত করা হোক। তৎকালীন ভারতের অন্যতম আইন-বিশারদ ডঃ জয়াকর অনুরোধ জানান মুসলিম সদস্যদের অনুপস্থিতিতে গণপরিষদে নেহেরুর প্রস্তাব মুলতুবী রাখা দরকার। এই সভায় আম্বেদকর যা বলেছিলেন তাতে তাঁর ভাবমূর্তি এক নতুন মাত্রা পেল। এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেস ও বেশির ভাগ মানুষই তাঁকে দেশদ্রোহী বলে মনে করত, কিন্তু তাঁর ভাষণে ফুটে উঠল তাঁর জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেমের মনোভাবটি। আম্বেদকরের সমর্থন পেলেন ডঃ জয়াকর।

এরপর বৃটিশ সরকার যখন ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার কথা ঘোষণা করল, তখন আম্বেদকর গণপরিষদে একটি দাবীপত্র পেশ করেন। তাতে অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে তফসিলীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে পৃথক নির্বাচনের কথা ছিল। ঐ দাবীপত্রটি 'রাষ্ট্র ও সংখ্যালঘু' নামে পুস্তিকাকারে ছাপা হয়।

ঐ পুস্তিকাটিকে আম্বেদকরের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার স্বর্ণময় ফসল হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। গণতন্ত্র নিছক শাসনযন্ত্রের কাঠামো নয়, তা যে সমাজ ব্যবস্থার এক সফল রূপরেখা এটা প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—গণতন্ত্রের দুটি মূল আধার—সামাজিক ও মানসিক কাঠামো—এতে আর্থ-সামাজিক সমানাধিকারের পাশাপাশি থাকা উচিত মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও সাম্যের প্রতিশ্রুতি। গণতন্ত্রের ছত্রছায়ায় সব মানুষ তার পেটের ও মনের ক্ষুধা মেটানোর উপকরণ পেতে পারে। প্রকৃত গণতন্ত্রে ব্যক্তিপূজার অবকাশ নেই, থাকতে পারে না, কারণ সবাই সমান। গণতন্ত্রের পাশাশাশি সমাজতন্ত্রকেও চান আম্বেদকর। কারণ দেশের সম্পদ যদি দেশের মানুষের হাতে থাকে তবে পুঁজিবাদ গড়ে উঠবে না, সমাজে শোষণও থাকবে না। শিল্প ও কৃষিজমি থাকবে সরকারের মালিকানাধীন, আর কৃষকের মধ্যে জমির ন্যায়সঙ্গত বণ্টন করতে হবে। মার্কসবাদের গোঁড়ামিতার তীব্র

সমালোচনা করলেও তিনি যা দাবী করছিলেন তা মার্কসবাদেরই মূল কথা, শুধু প্রয়োগপদ্ধতিটি ভিন্নতর। শেষে তিনি বলেন যে, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এগোলে দেশ সমৃদ্ধ হবে—মানুষ মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলবে।

ভারত স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ক্রমশঃ। ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন নতুন ভাইসরয় লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতে দুটি সরকার, দুটি গণপরিষদ ও সিলেট এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গণভোটের ঘোষণা করলেন। ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করার ব্যাপারে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে চাপ সৃষ্টি হতে লাগল।

অন্যদিকে ত্রিবাঙ্কুর, হায়দ্রাবাদ এবং কাশ্মীর স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে থাকার দাবী ঘোষণা করল। অন্যান্য দেশীয় রাজ্যগুলি তাদের ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী হয় ভারতে নয় পাকিস্থানে যোগ দেবার কথা জানিয়ে দিল। ভারতের সোসালিস্ট, কম্যুনিস্ট, হিন্দু মহাসভার প্রভৃতি দলগুলি নীরব দর্শক হয়ে রইল।

তারপর সেই বিশেষ লগ্নটি এগিয়ে এল—বৃটিশ সরকার ঘোষণা করল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।

ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেস প্রথম মন্ত্রীসভা গঠনে ব্যস্ত হয়ে উঠল। আগেই বলা হয়েছে উদারমনা নেহেরু সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আম্বেদকরকে মন্ত্রীসভায় যোগ দেবার ব্যাপারে।

আম্বেদকর তফসিলীদের স্বার্থেই নেহেরু মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়েছিলেন, কংগ্রেসী মন্ত্রীসভায় নয়, একথা তিনি তাঁর প্রথম সম্বর্দ্ধনা সভাতেই জানিয়ে দেন।

১৫ই আগস্ট ভারত বিভাজিত হয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্থান নামে দুটি রাষ্ট্র জন্ম নিল। আর সেই সঙ্গে দেশ বিভাজনের বিষময় ফলটি প্রকট হয়ে উঠল। দেশের চতুর্দিক থেকে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর আসতে লাগল। খোদ

রাজধানী দিল্লীতে বয়ে গেল রক্তের স্রোত। পাকিস্তানেও শুরু হয়ে গিয়েছিল নির্বিবাদে হত্যাকাণ্ড। আম্বেদকর প্রস্তাবিত জনগণের বিনিময় তত্ত্বটি যদি মেনে নেওয়া হত, তাহলে এই রক্তস্রোত নিশ্চয়ই বইতো না। গুজব রটলো হায়দ্রাবাদে জোর করে হিন্দুদের মুসলমান করা হচ্ছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে আম্বেদকর বিবৃতি দিলেন যে, তফসিলীরা যেন কিছুতেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করে। বর্ণহিন্দুদের অত্যাচারে জর্জরিত দলিত সমাজ যদি মনে করে থাকে মুসলমানরা তাদের আপনজন বলে গ্রহণ করবে তবে তা মারাত্মক ভুল হবে। ভারতের বেশির ভাগ সংবাদপত্র আম্বেদকরের এই জাতীয়তাবাদী ভূমিকার উচ্চ প্রশংসা করল। অনেকের সঙ্গে রাজর্ষি পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন বলেই ফেললেন ভারত বিভাগের জন্য দায়ী গান্ধীজীর অহিংসা নীতি।

১৯৪৮ সালের ১৩ই জানুয়ারী দিল্লীর মুসলমানদের পুনর্বাসন ও ক্ষতিগ্রস্ত মসজিদের সংস্কারের দাবীতে গান্ধীজী তাঁর প্রিয় অস্ত্র অনশন শুরু করলেন। সাম্প্রদায়িক সমস্যা তীব্রতর হয়ে উঠল। যার পরিণতি গান্ধীজীর মত মহান নেতার হত্যা।

১৯৪৮ সালের শেষের দিকে আম্বেদকরের বহুচর্চিত গ্রন্থ 'দি আনটাচেবল্‌স' প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক তথ্য নির্ভর এই গ্রন্থে তিনি দেখান যে অস্পৃশ্য শব্দটির জন্ম হয়েছিল খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে। তখন বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে নতুন করে প্রতিযোগিতায় নামা সাময়িকভাবে অবদমিত হিন্দুধর্মের সংঘর্ষ হয়। যেসব বৌদ্ধ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন নি তাদেরই অস্পৃশ্য আখ্যা দেওয়া হয়। পরে হিন্দুধর্ম অবশ্য বুদ্ধদেবকে দশম অবতারের এক অবতার হিসাবে মেনে নেয়। আম্বেদকরের মতে সে-যুগের নিষ্ঠাবান বৌদ্ধরাই বর্তমান ভারতের অস্পৃশ্য হয়ে আছেন।

দ্বাদশ পর্ব

দেশ স্বাধীন হয়েছে ঠিকই কিন্তু দলিত সমাজের কাঙ্খিত সুযোগ-সুবিধার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত আম্বেদকর কিছুতেই শান্ত হতে পারছিলেন না। নানা চিন্তা, ও সভা-সমিতিতে ভাষণ দিতে গিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে করতে আম্বেদকরের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে শুরু করেছিল। নানা রকমের স্নায়বিক অসুস্থতা তাঁকে বিপর্য্যস্ত করে তুলছিল। তাঁর পায়ের ব্যথা বাড়লে হাঁটা-চলা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যেত। রাতে সুনিদ্রা দূরের কথা, বহু বিনিদ্র রজনী কাটাতে হতো আম্বেদকরকে।

চিকিৎসার জন্য প্রায়ই তাঁকে বোম্বাই আসতে হত। সেই সময় হাসপাতালে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় ডাঃ শ্রীমতী সারদা কবীরের সঙ্গে। ডাঃ কবীর অত্যন্ত যত্ন সহকারে এই ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত মানুষটির চিকিৎসা করতেন। মানুষ আম্বেদকর স্বাভাবিক ভাবেই এই সেবার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতেন ডাঃ কবীরকে।

দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসার ব্যাপারে আসা-যাওয়া করতে করতে আম্বেদকর ও ডাঃ কবীরের মধ্যে এক নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। সেটা ঠিক রোগী ও চিকিৎসকের সম্পর্ক নয়, আরও গভীর কিছু।

গুণবতী স্ত্রী রমাবাইয়ের অকাল মৃত্যুর পর শোকাতুর আম্বেদকর ঘোষণা করেছিলেন দ্বিতীয় বিবাহে তাঁর কোনো ইচ্ছা নেই। কিন্তু জীবনের সিংহভাগ কাটিয়ে আসার পর ভগ্নস্বাস্থ্য, রণক্লান্ত আম্বেদকর ব্যক্তিগত জীবনে এমন একজন সাথী চাই-ছিলেন, যিনি তাঁর সব রকমের দায়-দায়িত্ব দরদ দিয়ে গ্রহণ করতে পারবেন। ডাঃ সারদা কবীরই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি তাঁর ঐ ধরনের সাথী হতে পারেন।

১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে তিনি তাঁর এক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অনুগামীকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর স্বাস্থ্য এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে যে ডাক্তারদের আশংকা ব্যাধি দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠতে পারে। শুধু পরিচারকরা যথাসাধ্য সেবা করলেও তাঁর এমন একজন সর্বক্ষণের সঙ্গী দরকার যে সহানুভূতি ও দরদ দিয়ে তাঁর সেবা করবে।

আরও অনেক ঘনিষ্ঠজনকে আম্বেদকর তাঁর দ্বিতীয় বিবাহের অভিপ্রায়ের কথা জানালেন। প্রত্যাশিত ঝড় উঠল তাঁর বিয়ের ব্যাপারে। কেউ কেউ এই বিয়ে নিয়ে আম্বেদকর ও তাঁর ছেলে যশবন্তের সম্পর্কে তিক্ততার সৃষ্টি করাতেও চেষ্টা করেছিলেন। এবং যেহেতু তাঁর বিয়ের কথা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, তাই জল বেশি ঘোলা হবার আগেই তিনি তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে নিতে মনস্থ করলেন। সেই হিসাবে দিন ধার্য হল ১৯৪৮ সালের ১৫ই এপ্রিল।

শত সমালোচনাতেও আম্বেদকর তাঁর সংকল্প থেকে বিচ্যুত হন নি। এই সময়ে ঘনিষ্ঠতম সহযোগী কে. ভি. চিত্তকে তিনি লিখেছিলেন—আমি যা করতে চলেছি তার জন্য আমার নৈতিক অধঃপতন হচ্ছে বলে মনে করি না। এ ব্যাপারে কারুরই অভিযোগের কোনো কারণ থাকতে পারে না, এমন কি যশবন্তেরও না। শেষোক্তজনকে আমি দিয়েছি প্রায় ৩০,০০০ টাকা, উপরন্তু একটি বাড়ী। যার বর্তমান মূল্য কমপক্ষে ৮০,০০০ টাকা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি যা করেছি, একজন পিতা তার পুত্রের জন্য এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারে না।

ভাগ্যের কি বিচিত্র পরিহাস—দলিত সমাজের অবিসম্বাদিত নেতা ডঃ আম্বেদকর যিনি সারা জীবন বর্ণহিন্দু বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের অকথ্য অত্যাচারের প্রতিবাদে সরব ছিলেন, সেই তিনি ৫৬ বছর বয়সে বিয়ে করতে চলেছেন এক সারস্বত ব্রাহ্মণ কন্যাকে! আবার অন্যদিক থেকে দেখলে প্রশ্ন উঠতে পারে যিনি বর্ণহিন্দু

সমাজে কালাপাহাড় নামে কুখ্যাত ছিলেন, এক ব্রাহ্মণ কুমারী কন্যা, উচ্চশিক্ষিতা ডাক্তার স্বেচ্ছায় তাঁকে বিয়ে করলেন কেন? হয়ত এটাই ছিল বিধিলিপি।

সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুসারে ১৯৪৮ সালের ১৫ই এপ্রিল আম্বেদকর ও ডাঃ কবীরের বিবাহ সম্পন্ন হল। উপস্থিত ছিলেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন বন্ধু ও অনুগামী। নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকাতেও গুরুত্ব সহকারে এই সংবাদ ছাপা হয়েছিল।

সংগ্রামী জীবনে আম্বেদকর যাঁদের সব সময়ে পাশে পেতেন তাঁদের বেশির ভাগই এই বিবাহ মেনে নিতে পারেন নি, এবং দূরে সরে যেতে শুরু করেন। ফলে অভিমানী আম্বেদকর দারুণ আঘাত পান মানসিক ভাবে এবং এর ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

আম্বেদকর যে তাঁর পুত্রের জন্য চিন্তা করতেন না তা নয়। এই ঘটনার চার বছর আগে থেকে তিনি চেষ্টা চালাচ্ছিলেন যশবন্তকে কোনো এক ভদ্র ব্যবসায়ে লাগিয়ে দিতে, এবং সে ব্যাপারে তাঁর বন্ধু নাভাল বাখেনাকে চিঠিও লিখেছিলেন। বন্ধুবর চেষ্টাও করেন, কিন্তু যশবন্ত ব্যবসা ঠিক মত করতে পারলেন না।

ত্রয়োদশ পর্ব

আম্বেদকরের ৫৭তম জন্মদিনে বেশ জাঁকজমক করে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। বোম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী বি. জি. খের প্রশংসাবাক্যে প্লাবিত করেছিলেন আম্বেদকরকে। কংগ্রেস নেতা এস. কে. পাতিল অন্য এক সভায় একথাও বলেন যে গোটা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা আম্বেদকর একাই করার যোগ্যতা রাখেন।

দলিত সমাজের নেতা হলেও আম্বেদকর মূলতঃ ছিলেন সমাজ-সংস্কারক ও আদর্শবাদী। তাই দেখা যায় যে আইনমন্ত্রী হিসাবে

তিনি যে সব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সেগুলি সবই জনকল্যাণের জন্য।

১৯৪১ সালে স্যার বি. এন. রাও-এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল, যার উপর দায়িত্ব অর্পিত হয় হিন্দু আইনের সংস্কার সাধন করা। ঐ কমিটি সারা দেশে ঘুরে ঘুরে জনমত যাচাইয়ের পর একটি খসড়া বিল তৈরি করে, যার নাম হিন্দু কোড বিল।

ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন হয়েছে। খসড়া বিলের দায়িত্ব অর্পিত হল আইনমন্ত্রী আম্বেদকরের ওপর। সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের কথা মাথায় রেখে বিলটির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আম্বেদকর তার ত্রুটি বিচ্যুতিগুলির সংশোধন করা শুরু করলেন। ফলে বিলটি আদতে যে ভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল তা আমূল পাল্টে গেল। বিশেষ করে যৌথ পরিবারের ক্ষতিকারক দিকগুলি, সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদি সম্পর্কে আম্বেদকর যে-সব সুপারিশ করলেন তা সমগ্র হিন্দু সমাজের সনাতনপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে মর্মান্তিক হয়ে উঠল। অন্যদিকে ভারতের উদারপন্থী প্রগতিশীল নেতারা ডঃ আম্বেদকরের এই সুদৃঢ় পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করলেন।

বর্ণহিন্দুদের পক্ষ থেকে বিরোধীতা করে বলা হল সুপ্রাচীন নীতিশাস্ত্র মনুস্মৃতির সঙ্গে অসঙ্গতি থাকায় হিন্দু কোড বিল গ্রহণযোগ্য নয়। এর ফলে হিন্দুত্ব বিনষ্ট হবে। আম্বেদকর দেখালেন হিন্দু কোড বিলে উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা শাস্ত্রীয় দায়ভাগ রীতি অনুযায়ী, বিবাহ বিচ্ছেদের আইন প্রণীত হয়েছে কৌটিল্য ও পরাশর স্মৃতির ব্যবস্থা অনুযায়ী এবং নারীদের সম্পত্তির অধিকারের কথা তো বৃহস্পতি স্মৃতিতে বলাই আছে, অতএব হিন্দু নিয়ম-কানুন অনুসরণ করেই এই বিল প্রস্তুত করা হয়েছে।

১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে বোম্বাই তফসিলী ফেডারেশন

এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করে তাঁদের প্রিয় 'বাবাসাহেব'কে একটি সোনার পাত্রে ভারতের সংবিধান উপহার দিলেন। ঐ সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে আম্বেদকর বলেন যে ভারতের রাজনৈতিক তৎকালীন পরিস্থিতিতে স্বার্থপরের মত শুধু তফসিলী সম্প্রদায়ের হয়ে সংগ্রাম বা আন্দোলন করলে চলবে না, সমগ্র ভারতের নির্যাতিত ও বঞ্চিত মানুষের উন্নতিবিধানে ব্যাপকতর ও বৃহত্তর সংগ্রাম ও আন্দোলন চালাতে হবে।

আম্বেদকরের জনপ্রিয়তা সর্বভারতীয় স্তরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল এক মহান জাতীয়তাবাদী নেতা হিসাবে। নানা জায়গায় তাঁর জন্মজয়ন্তী পালিত হতে লাগল মহাসমারোহে। ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আহূত সভায় সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করে বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি উদারমনা এম. সি. চাগলা। সহপাঠীর গুণে মুগ্ধ বিচারপতি চাগলা শত মুখে আম্বেদকরের প্রশংসা করে বলেন যে, বর্তমানে ভারতের নাগরিকরা যে নাগরিক অধিকার ভোগ করছেন তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আম্বেদকরের কাছে। তফসিলী সমাজের মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে ডঃ আম্বেদকরের জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে তিনি আসেন নি, এসেছেন ভারতের এক মহান জাতীয় নেতার জন্ম-জয়ন্তীতে শ্রদ্ধা জানাতে। বিচারপতি চাগলা এ কথাও বলেন যে, তিনি আম্বেদকরের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে ব্যারিস্টারী পড়তেন, একসঙ্গে বোম্বাই হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেছেন এবং একসঙ্গে ল' কলেজে অধ্যাপনাও করেছেন—এর জন্য তিনি বিশেষ গর্ব অনুভব করেন।

দিল্লীর অনুষ্ঠানে সংসদ কে. হনুমন্তিয়া বলেছিলেন সব গুণ বিচার করলে বলা যায় যে একদিন আম্বেদকর ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবেন। অন্য এক সাংসদ আর. কে. সিধবা বলেন যে আম্বেদকরের আন্দোলনের ফলেই গান্ধীজী অস্পৃশ্যদের অধিকার মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৯৫১ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী সংসদে পেশ করলেন হিন্দু কোড বিল। তার অনেক আগে থাকতেই উক্ত বিলের তীব্র সমালোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নেহেরু প্রথম দিকে হুমকী দিয়েছিলেন এই বিল পাশ না হলে তিনি পদত্যাগ করবেন। জোর বিতর্কের মাধ্যমে আম্বেদকর জানান যে ১৮৩০ সালের প্রিভি কাউন্সিল অনুমোদিত আইনের ফলে শিখ, বৌদ্ধ, জৈনরা হিন্দু আইনের আওতাভুক্ত হয়ে গেছে, তাই তাদের তরফ থেকে কোনো আপত্তি চলতে পারে না। সাময়িকভাবে বিলটি মুলতুবী রাখা হল নানা ধরনের চাপে পড়ে।

এর কয়েক মাস পরে এপ্রিল মাসে একটা অনুষ্ঠানে সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ আনেন দলিত সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব দেখানোর জন্য। নিজে মন্ত্রী হয়ে, সেই মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার ফলে অনেকেই অসন্তুষ্ট হন, এমন কি প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে নিজের অসন্তোষের কথা আম্বেদকরকে জানালেন। এই নিয়ে বিক্ষোভ এত বেড়ে যায় যে মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে গড়ার জন্য নেহেরু পদত্যাগ পর্যন্ত করতে চাইলেন। এমত অবস্থায় কি করা উচিত তা ঠিক করার জন্য আম্বেদকর চলে এলেন বোম্বাই দলের অন্য নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য। সিদ্ধান্ত হল এই যে, যেহেতু হিন্দু কোড বিল পাশ হলে সেটা হবে দলিত সমাজের পক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক বিজয়, তাই ওই বিল পাশ না হওয়া পর্যন্ত আম্বেদকর যেন পদত্যাগ না করেন।

এই সময়ে সুপ্রীম কোর্টের একটি রায়ে মাদ্রাজ সরকারের সংরক্ষণের ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি এবং চাকরী পাওয়া সংক্রান্ত আইনটিকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। সুপ্রীম কোর্ট ভারতীয় সংবিধানের ১৫ (১) এবং ২৯ (২) অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে ঐ রায় দেয়। সংবিধানের মূল তাৎপর্য বজায় রাখার জন্য ঐ দুটি অনুচ্ছেদ সম্পর্কে একটি সংশোধনী বিল আনেন আম্বেদকর এবং

জোরালো যুক্তি দিয়ে তা অনুমোদনও করিয়ে নেন।

১৫ (১) অনুচ্ছেদে ধর্ম, প্রজাতি, জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে বিভেদ না করা এবং ২৯ (২) অনুচ্ছেদে সরকারী ও সরকারী সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেবল ধর্ম, প্রজাতি, জাতি, ভাষা ইত্যাদির কারণে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা চলবে না—আম্বেদকর যে সংশোধনীটি পাশ করান, তার বয়ান এই—"সামাজিক ভাবে ও শিক্ষায় অনগ্রসর শ্রেণীর নাগরিকদের উন্নতি সাধনের জন্য রাজ্য কর্তৃক কোনো বিশেষ বিধি প্রণয়নে ১৫ (১) বা ২৯ (২) অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না।

এটাই ছিল সংবিধান (প্রথম সংশোধন) আইন, ১৯৫১। এই সংশোধনী আইন পাশ না হলে তফসিলী বা অনুন্নত শ্রেণীর কোনো নাগরিক কোনো কালেই চাকরী বা শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পাবার অধিকারী হত না।

বর্ণহিন্দুরা এমনিতেই আম্বেদকরের ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিল না। তার ওপরে ১৯৫১ সালের মে মাসে বুদ্ধ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেবার সময় তিনি আবার হিন্দুধর্মের বিরূপ সমালোচনা করলেন। এর প্রভাব পড়ল হিন্দু কোড বিলের ওপর। সংসদের অধিকাংশ সদস্য বিলটির বিপক্ষে চলে গেলেন। ফলে বিলটি সম্পর্কে সংসদে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অনুমতি দিতে হল প্রধানমন্ত্রী নেহেরুকে। নতুন শর্ত আরোপিত হল—বিলটিকে দুভাগে ভাগ করে দ্বিতীয় অংশটি 'বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ বিধি' নামে প্রথমে সংসদে পেশ করতে হবে।

১৯৫১ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর ব্যাপক পুলিশী প্রহরায় সংসদে বিলটির দ্বিতীয় অংশের আলোচনা শুরু হয়। কারণ সকাল থেকে ওখানে উত্তেজিত মহিলারা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, সর্দার ভূপেন্দ্র সিং ও পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য এর বিরোধীতা করেন সর্বতোভাবে।

বিলের সমর্থনে এগিয়ে এলেন এন. ভি. গ্যাডগিল, পণ্ডিত

কুঞ্জধর ও মহিলা সদস্যরা। বিতর্ক চলাকালীন রাম-সীতা সম্পর্কে একটা আপত্তিকর মন্তব্য প্রকাশ করায় আম্বেদকরের বিরুদ্ধে সংসদের প্রায় সবাই বিক্ষোভ দেখান। আম্বেদকর শেষ পর্যন্ত তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করে নিলেও বিলটির অপমৃত্যু রোধ করতে পারলেন না।

এই ঘটনায় চরম অপমানিত হয়ে আম্বেদকর মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করার জন্য নেহেরুকে পত্র পাঠান। যেহেতু কয়েকটি সরকারী বিল সম্পর্কে আম্বেদকরের বক্তব্য পেশ করা আগে থাকতে স্থির করা ছিল, তাই সৌজন্যের খাতিরে ঐ বিলগুলি সম্পর্কে আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

নির্দিষ্ট দিনে তাঁর বক্তব্য পেশ করতে যখন আম্বেদকর সংসদে আসেন, তখন লোকসভার ডেপুটি স্পীকার আম্বেদকরকে তাঁর বক্তব্যের একটা কপি আগে তাঁর কাছে জমা দিতে বলেন। ক্ষুব্ধ অপমানিত আম্বেদকর এর প্রতিবাদে সঙ্গে সঙ্গে লোকসভা ছেড়ে চলে যান।

পরের দিন অর্থাৎ ১৯৫১ সালের ১২ই অক্টোবর আম্বেদকরের পদত্যাগ পত্রের পূর্ণ বয়ান সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল।

যে-সব কারণে তিনি পদত্যাগ করেন তার মধ্যে প্রধান প্রধান-গুলি এই ঃ—

প্রথমতঃ হিন্দু কোড বিল সম্পর্কে নেহেরুর দুর্বল নীতি তিনি মেনে নিতে পারেন নি। প্রথম অত্যন্ত প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি বলেছিলেন এই বিল পাশ না হলে তিনি পদত্যাগ করবেন, পরে সেই নেহেরুই সকলের সঙ্গে আপোষ রফা করে বিলটিকে পাশ হতে দেন নি।

দ্বিতীয়তঃ প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও তাঁকে পরিকল্পনা দপ্তর দেওয়া হয় নি।

তৃতীয়তঃ নেহেরু সরকার তফসিলীদের উন্নয়ন সম্পর্কে আদৌ

আগ্রহী নয় প্রকৃত অর্থে।

চতুর্থতঃ ভারত সরকারের কাশ্মীর-নীতি মেনে নিতে পারছেন না, তাঁর পরামর্শ ছিল কাশ্মীরের মুসলমান প্রধান অংশ চলে যাক পাকিস্তানে এবং হিন্দু-শিখ-বৌদ্ধ প্রধান অংশ যুক্ত হোক ভারতের সঙ্গে।

পঞ্চমতঃ ভারতের ভ্রান্ত বৈদেশিক নীতির ফলে বহির্বিশ্বে ভারতের প্রকৃত বন্ধু রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় নি। তাই প্রতিরক্ষা খাতে মোট বাজেটের ৩০ শতাংশ ব্যয় করতে হচ্ছে, ফলে উন্নয়ন কর্মে বিনিয়োগ কমছে।

চতুর্দশ পর্ব

১৯৫০ সালে ভারতে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হবার পর রীতি অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের ব্যাপারটি অগ্রাধিকার পেল এবং সেই অনুযায়ী ১৯৫২ সালে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা হওয়া মাত্র সকল দল সক্রিয় হয়ে উঠল। তফসিলী ফেডারেশনও নিজেদের কর্মপন্থা ঠিক করার জন্য দিল্লীতে সভা ডাকে। কঠোর পরিশ্রম করে আম্বেদকর তাঁর দলের নির্বাচনী ইস্তাহার প্রস্তুত করলেন। তাঁর দল কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট বা হিন্দু মহাসভা কারুর সঙ্গেই নির্বাচনী আঁতাত করবে না, এটা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হল ঐ ইস্তাহারে। বিখ্যাত তাত্ত্বিক নেতা মানবেন্দ্র নাথ রায় ভূয়সী প্রশংসা করলেন আম্বেদকরের ইস্তাহারকে, তিনিও কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে সহমত ছিলেন আম্বেদকরের সঙ্গে। শেষে একমাত্র সোশ্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে একযোগে নির্বাচন লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিল ফেডারেশন।

দিল্লী থেকে বোম্বাই আসার আগে আম্বেদকর জলন্ধর ও লক্ষ্ণৌতে দুটি বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। সর্বত্র তাঁর একই বক্তব্য ছিল যে, তফসিলীদের কখনোই নিজেদের ভবিষ্যৎ উন্নতি-

সাধনের জন্য কংগ্রেসের কথায় আস্থা রাখা উচিত হবে না।

১৯৫১ সালের ১৮ই নভেম্বর আম্বেদকর বোম্বাইতে এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতা দেন, ঐ সভা আহ্বান করেছিল ফেডারেশন ও সোশ্যালিস্ট পার্টি যৌথ ভাবে। ঐ সভায় আম্বেদকর বলেছিলেন যে—দেশকে স্বাধীন করার কৃতিত্ব ও সম্মান প্রকৃতপক্ষে সুভাষচন্দ্র বসুরই প্রাপ্য, কংগ্রেসের নয়।

শারীরিক ভাবে অসুস্থ থাকার জন্য আম্বেদকর খুব বেশি নির্বাচনী সভায় যোগ দিতে পারেন নি, এমন কি বোম্বাইয়ের বাইরেও খুব একটা যেতে পারেন নি। তাঁদের নির্বাচনসঙ্গী সোশ্যালিস্ট পার্টির সংগঠন প্রধানতঃ ছিল শহর এলাকায়, গ্রামাঞ্চলে তাদের তেমন কোনো প্রভাব ছিল না।

১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন যজ্ঞ শুরু হয়েছিল। বোম্বাইয়ের ফলাফল ঘোষিত হলে সবাই চমকে উঠেছিলেন—ডঃ আম্বেদকর হেরে গেছেন কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে ১৪৩৭৪ ভোটে।

এই পরাজয়ে আম্বেদকর চরম হতাশ হলেও, হতোদ্যম হন নি। নির্বাচনে নিশ্চিত জয় ধরে নিয়ে তিনি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কিছু কিছু করেছিলেন। সেগুলির কি হবে? তাঁকে রাজ্যসভায় মনোনয়ন দেবার চেষ্টা চলল। মার্চ মাসে বোম্বাই থেকে যে ১৭ জন সদস্য নির্বাচিত হয়ে রাজ্যসভায় যাবার কথা ছিল পি. এন. রাজভোজের আপ্রাণ চেষ্টায় আম্বেদকর তাদের একজন হলেন। সংসদীয় রাজনীতি থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখা গেল না।

এইবার নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন আম্বেদকর। ১৯৫২ সালের মে মাসে রাজ্যসভার অধিবেশন শুরু হল। বাজেট সম্পর্কিত বিতর্ক শুরু হওয়া মাত্র স্বমূর্তি ধারণ করলেন আম্বেদকর। ভারতের পররাষ্ট্র বিষয়ক নীতি সঠিক না হওয়ার ফলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ভাল নয়, তাই প্রতিরক্ষা

খাতে ৫০ কোটি টাকার চেয়ে অনেক বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। যদি আমরা বহির্বিশ্বের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখি এবং প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ অর্থ কমাতে পারি, তাহলে ঐ উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে দেশের উন্নয়ন মূলক কাজগুলি আরও ভালভাবে করা যাবে।

এই সময় কোলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আম্বেদকরকে 'ডক্টর অফ-ল' উপাধি দেবার কথা জানিয়ে পত্র আসে, উপলক্ষ্য ভারতের মহান সংবিধান রচয়িতাকে সম্মানিত করা। তৎকালীন কোলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল আইসেন হাওয়ার মানপত্র তুলে দেন আম্বেদকরের হাতে ১৯৫২ সালের ৫ই জুন তারিখে।

১৪ই জুন বোম্বাইতে ফিরে আসার পর আম্বেদকরের সম্মানার্থে যে সভা করা হয় তাতে সিদ্ধার্থ কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ ভি. এস. পতঙ্কর খেদের সঙ্গে বলেছিলেন যে ভারতে এত বিশ্ব-বিদ্যালয় থাকতে ভারতেরই সংবিধান রচনা করার জন্য আম্বেদকরকে মানপত্র নিতে হল বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে—এর চেয়ে দুঃখের আর কি আছে। এখানে একটা সূক্ষ্ম আভাস দিয়েছিলেন ডঃ পতঙ্কর—ডঃ আম্বেদকর অস্পৃশ্য দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ বলেই কি এই অবহেলা?

এতদিন সরকারী মন্ত্রী থাকার পর এখন রাজ্যসভায় তিনি বিরোধীপক্ষের নেতা হয়েছেন, এবং বিরোধী নেতা হিসাবে যা যা করা দরকার আম্বেদকর তা করতে শুরু করলেন। সংসদীয় দায়িত্ব পালন তো তাঁকে করতেই হবে, অথচ সমাজের সেবা করাটাই মূল কথা, এটা ধরে নিয়ে ব্যাপক গণসংযোগের মাধ্যমে তিনি বহু লোকের সংস্পর্শে এসে দলিত সমাজের মূল ভুল ত্রুটির দিকগুলি তুলে ধরা শুরু করলেন। একটি কলেজের ছাত্র সম্মেলনে তিনি বক্তৃতা দিতে গিয়ে সেই মূল সত্যটির পুনরাবৃত্তি করলেন—শিক্ষাই মনুষ্য জীবনের প্রধান ভিত্তিভূমি। কোনো দেশের মানুষ ও সমাজের উন্নতি নির্ভর করে ভবিষ্যতের নাগরিক ছাত্রসমাজের ওপর—তাই তাদের উচিত প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা।

কোলহাপুরে মহিলা সম্মেলনে ভাষণ দেবার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, দেশে বহু মহিলা নেত্রী আছেন, তাঁরা কিন্তু নারী সমাজের উন্নতির জন্য কোনো কিছু করার ব্যাপারে উদাসীন। হিন্দু কোড বিল যে সত্যসত্যই ভারতের নারীসমাজের মুক্তির অন্যতম পথ একথা জানিয়ে তিনি একটু রসিকতা করেই বলেছিলেন যে, মাত্র দুজন স্থূলকায়া মহিলা সংসদের সামনে অনশন শুরু করলেই হিন্দু কোড বিল পাশ করতে বাধ্য হবে নেহেরু সরকার।

বেলগাঁও-এ ৫০ হাজারের এক মহতী সভায় চরম কথা বললেন আম্বেদকর—আরও কয়েক বছর, এমন কি পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্তও আমি অপেক্ষা করব আমার সমাজের মানুষজনের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে সরকার কি করে তা দেখতে। এবং যদি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কোনো নতুন ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয় তবে কঠোরতম পদক্ষেপ নিতে আমরা বাধ্য হবো।

এই হুঁশিয়ারী অন্য সকলকে সচকিত করে তুলেছিল। অবশ্য কোনো কোনো কাগজে বলা হয় যে, এরকম ফাঁকা আওয়াজ আম্বেদকর মাঝে মাঝেই দিয়ে থাকেন, তাই এ নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই।

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রথম হায়দ্রাবাদ-দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৩ সালের ১২ই জানুয়ারী আম্বেদকর সাম্মানিক 'ডি-লিট' উপাধি দিয়ে গুণীর মান রাখল।

১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জাপানের ইন্দো-জাপানী সাংস্কৃতিক সমিতির উপ-সভাপতি এম. আর মূর্তির সম্মানে নতুন দিল্লীতে আয়োজিত এক সভায় আম্বেদকর বললেন—অনেক চিন্তার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, আগামী প্রজন্মদের বুদ্ধদেবের উপদেশ অথবা কার্ল মার্ক্সের উপদেশ—দুটির মধ্যে

একটিকে বেছে নিতে হবে। বর্তমানে পশ্চিমের চেয়ে পূর্ব মহাদেশ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, তাই আশংকা যে, পূর্ব মহাদেশ যদি বুদ্ধদেবের উপদেশবাক্য মেনে না চলে তবে এশিয়াতেও ইউরোপের মত সংঘর্ষ চলবে।

আম্বেদকর ফাঁকা আওয়াজ দিয়েছিলেন কিনা তার পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথাই বলা যায় যে, সংসদে তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয় অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে উপযুক্ত আইন পাশ করে তাদের জন্য ভাল কিছু করতে। কিছু তফসিলী সংসদ জানান যে কাগজে-কলমে অস্পৃশ্যতা দূর করা হয়েছে বলা হলেও, বাস্তব সত্য কিন্তু ভিন্নরূপ। এক হরিজন সদস্য অভিযোগ করেন যে, তিনিও একজন হরিজন এম. এল. এ. চা খাবার পরে, হোটেল মালিক তাঁদের ব্যবহার করা কাপগুলি লাথি মেরে বাইরে ফেলে দেয়। অন্য দৃষ্টান্ত—হায়দ্রাবাদের এক হরিজন মন্ত্রীকে মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয় নি, লাঠি নিয়ে ভয় দেখিয়ে এবং খোদ দিল্লীতে এক হরিজন সংসদের দাড়ি কামাতে অস্বীকার করেছে এক নাপিত। এবং তৎসত্ত্বেও কিছু বর্ণহিন্দু নেতা অভিযোগ করেন যে আম্বেদকর অযথা চেঁচামেচি করেন অস্পৃশ্যতার ব্যাপারে।

১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্যসভার অধিবেশনে আম্বেদকর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কৈলাসনাথ কাটজুর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে অবিলম্বে একটা বিল পাশ করতে বলেন যাতে সংখ্যালঘু দলিত সমাজের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠরা অত্যাচার, নিপীড়ন আর না করে। কাটজু পাল্টা জবাবে বলেন সংবিধানের প্রধান স্থপতি তো ছিলেন স্বয়ং আম্বেদকর, তাতেই কেন ঐ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা রাখেন নি তিনি। এর প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ আম্বেদকর বলেন যে, এ কথা তাঁকে প্রায়ই শুনতে হয়, তবে আসলে সংবিধান রচনা করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন একজন ভাড়াটে লেখক। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কাজ তাঁকে করতে হয়েছিল সংবিধান রচনা করতে গিয়ে। তারপর কাটজুর কাছ থেকে ব্যাঙ্গাত্মক খোঁচা খেয়ে রেগে

গিয়ে আম্বেদকর বলেছিলেন, 'মহাশয়, আমার বন্ধুরা বলেন আমিই সংবিধান রচনা করেছি। কিন্তু আজ এ কথা আমি বলতে প্রস্তুত যে আমিই প্রথম ব্যক্তি সেটা পুড়িয়ে ফেলতে চাই। এই সংবিধান আমি চাই না।'

৩৫৬নং অনুচ্ছেদের প্রয়োগ করে ভারত সরকার যখন পেপসুতে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু করল, তখন আম্বেদকর অভিযোগ করেন যে, সরকার সংবিধানের দুর্বলতর দিকগুলির সুযোগ নিচ্ছে। সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও মোরারজী দেশাইকে বোম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী করাতে আম্বেদকর সমালোচনা করেন এই বলে যে, সরকার সংবিধানের বিশেষ ক্ষমতাগুলির অপপ্রয়োগ করছে।

১৯৫৩ সালে ৯ই সেপ্টেম্বর 'সম্পত্তিকর' সম্পর্কিত বিল নিয়ে বিতর্কে যোগ দিয়ে আম্বেদকর বলেন যে, আমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইউরোপের দৃষ্টান্ত দিই। কিন্তু যা ইউরোপের পক্ষে ভাল, তা আমাদের দেশে কাঙ্ক্ষিত ফল নাও দিতে পারে, কারণ তাদের সঙ্গে আমাদের সমাজ জীবনের মানদণ্ডের পার্থক্য আছে প্রচুর।

এর কয়েক মাস পরে 'অস্পৃশ্যতা (অপরাধ) আইন' সম্পর্কিত বিলটি সংসদে উত্থাপিত হলে আম্বেদকরের রসনা ক্ষুরধার হয়ে ওঠে—তিনি বলেন—যত সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যই কোনো আইনের থাক না কেন, তা অন্তঃসারশূন্য হয়ে যায় যদি সেই আইন সঠিক ভাবে প্রয়োগ না করা হয়। অস্পৃশ্যতার ব্যাপারে অপরাধ করলে কারাবাসের দণ্ডের দাবীও তিনি করেছিলেন।

প্রধানতঃ গ্রামভিত্তিক ভারতে দোকান-পসার, হাট-বাজার, টাকা-পয়সার লেন-দেন ইত্যাদি বেশির ভাগ অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয় উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা, তাই সামাজিক বয়কটের ভয় দেখিয়ে দলিত সমাজের মানুষজনকে সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এই সামাজিক বয়কট করাকেও আইনগত ভাবে অপরাধ বলে মানতে হবে।

১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে মহারাষ্ট্রের পতিত জমি দলিত

সমাজের কৃষিজীবীদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার দাবীতে বিশালাকারে সত্যাগ্রহ হয় তফসিলী ফেডারেশনের নেতৃত্বে। প্রায় ১৭০০ জন সত্যাগ্রহী কারাবরণ করেন ও ১১০০ জনকে নিঃশর্তে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

আম্বেদকর যে সব সময়ে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করতেন তার প্রমাণ ১৯৫৪ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত ভাণ্ডারা লোকসভার উপনির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার বিষয়টি। নির্বাচনে জয়-পরাজয় নিয়ে তিনি এত উদ্বিগ্ন ছিলেন না, যতটা উদ্বিগ্ন ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। ভারতের বিদেশ নীতি খুব সুস্পষ্ট নয়,—ভারতকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা পৃথিবীর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক ও বন্ধুত্ব চায়, না, কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলির বন্ধুত্ব চায়। সংবিধান অনুযায়ী গণতন্ত্রের পূজারী হলেও ভারত সোভিয়েত দেশ ও চীনের মত কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে চাইছে—এটা ঠিক না।

ঐ উপনির্বাচনে আবার আম্বেদকর পরাজিত হলেন কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে।

রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে ভারতের বিদেশ নীতির সমালোচনায় তিনি আবার মুখর হলেন। প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর বিদেশ নীতির তিনটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল—(ক) শান্তি নীতি, (খ) সাম্যবাদী শিবির ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী শিবিরের সঙ্গে সহাবস্থানের নীতি এবং (গ) সিয়াটো বিরোধী নীতি—এই নীতিগুলির তীব্র সমালোচনা করে আম্বেদকর বলেছিলেন—নেহেরুর শান্তি নীতি মূলতঃ দুর্বলের নীতি, কারণ পৃথিবীর শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি নিজেদের স্বার্থে এবং খেয়ালখুশি অনুসারে কখনো দুর্বল রাষ্ট্রকে গ্রাস করছে বা কখনো তাদের খণ্ড-বিখণ্ড করে দিচ্ছে। রাজনীতির লক্ষ্মীও বলীর বাহুকে সম্মান করে।

মার্কসবাদ ও গণতন্ত্রের সহাবস্থান অনেকটা সোনার পাথর বাটির মতো। মার্কসবাদ চায় পৃথিবীর সব শক্তিগুলিকে করায়ত্ত

করতে। যেমন সোভিয়েত রাশিয়া ইউরোপের অনেক সন্নিহিত ছোট ছোট রাষ্ট্রকে জোর করে দখল করে নিয়েছে। চীনের অধীনস্থ কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়াও তারা নিজেদের কব্জায় এনেছে। তাই সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ভারত সমগ্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির কাছে বিশ্বাস যোগ্যতা হারিয়েছে। বান্দুং সম্মেলনের ফলশ্রুতি হিসাবে নেহেরুর পঞ্চশীল নীতিতে বৌদ্ধধর্মের গন্ধ থাকলেও দেখা যাচ্ছে চীন তার সীমান্তবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা তিব্বতকে গ্রাস করে ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত নিজেদের আধিপত্য ছড়িয়ে দিয়েছে। আম্বেদকর প্রশ্ন তুলেছিলেন মাও সে তুঙ্গের তিব্বত গ্রাস নীতি, ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না তো? তিনি যে দূরদর্শী ছিলেন তার প্রমাণ ৭।৮ বছরের মধ্যে চীন কর্তৃক ভারত সীমান্ত আক্রমণ—অথচ তখনও চলছিল হিন্দি-চীনি ভাই ভাইয়ের স্লোগান।

সিয়াটো চুক্তির বিরোধীতাও নেহেরুর সাজে না, কারণ সিয়াটো অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সন্ধি সংগঠনের গণতান্ত্রিক জোট পৃথিবীর মুক্ত অঞ্চলগুলিতে সাম্যবাদের প্রসারকে রোধ করার সংকল্প নিয়েছিল। এর বিরোধীতা করে নেহেরু কার্যতঃ মার্কস-বাদের আগ্রাসী নীতিকে পরোক্ষে সমর্থন জানালেন।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পর্তুগীজ রাজ্য গোয়ার ব্যাপারে আন্দোলনের যে কোনো মানে হয় না, এটাও বিশ্বাস করতেন আম্বেদকর।

ভারতের আর্থ-সামাজিক সংস্কারের ব্যাপারে আম্বেদকরের পরিকল্পনাগুলি যে কতটা বিজ্ঞানসম্মত ছিল তা আজ বোঝা যায়। তিনি তফসিলী জাতি ও উপজাতি কমিশনারের প্রতিবেদনের বিতর্কের উত্তরে বলেছিলেন যে, নিয়ম করে বছরের পর বছর সংবিধান সংশোধন করেও তফসিলীদের কোনো উপকার যখন করা যাচ্ছে না, তখন ভারতের সমস্ত অনাবাদী পতিত জমি রেকর্ড করে, সরকারী অধিগ্রহণের পর যেন ভূমিহীন তফসিলী সম্প্রদায়ের কৃষকদের ভাগ করে দিয়ে দেওয়া হয়। লবণ কর তুলে দেবার

দরকার নেই, তার পরিবর্তে লবণ কর থেকে প্রাপ্ত আয় যেন নিয়োগ করা হয় তফসিলীদের প্রদত্ত পতিত জমির উন্নয়নার্থে। জমিদার ও জোতদারদের মোট জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়ে উদ্বৃত্ত জমি যেন ভূমিহীন তফসিলীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। তখন আম্বেদকরের এই প্রস্তাবগুলি যথোচিত মর্যাদা না পেলেও এখন গ্রাম ভারতের সার্বিক উন্নতির জন্য কংগ্রেস থেকে শুরু করে বামপন্থী দলগুলিও তা প্রয়োগ করে সাফল্য অর্জন করছে।

তফসিলীদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তনই যে ঘটছিল না তা দেখতে পাচ্ছিলেন আম্বেদকর। তিনি প্রধানমন্ত্রীকেও এর জন্য দায়ী করেন। এ নিয়ে তিনি রাজ্যসভায় অভিযোগও তোলেন। কংগ্রেসীদের মধ্যে যারা তফসিলী সম্প্রদায়ের তারা একটা আলাদা সম্মেলনের আয়োজন করেছিল, নেহেরুর বিরোধীতায় তা অনুষ্ঠিত হতে পারে নি। রাজা গোপালাচারী শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন তফসিলী ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশ পাঠানোর ব্যবস্থা বন্ধ করে দেন, অথচ মুখে তিনি নিজেকে তফসিলীদের বন্ধু বলে দাবী করতেন। রাজ্যগুলিও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। পাঞ্জাব সরকার তফসিলী ও দলিত সমাজের মানুষ-জনের স্থায়ী ঘরবাড়ী তৈরী করার উপর আইনগত বিধি-নিষেধ জারী করেছিল।

১৯৫১ সালে গঠিত আম্বেদকর হীরকজয়ন্তী কমিটির সভাপতি ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে তফসিলী ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এক লক্ষ ১৮ হাজার টাকা তুলে দেন তাঁর হাতে। আম্বেদকর ঐ অর্থ দিয়ে দাদরে একটি পাবলিক হল এবং একটি ভাল লাইব্রেরী তৈরী করার প্রস্তাব দেন। এই সময়ে তিনি বলেন যে, তাঁর সাফল্যের মূলে আছে দলিত সমাজের ঐকান্তিক সহযোগিতা, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

পঞ্চদশ পর্ব

১৯৫৪ সালের ৩রা অক্টোবর আকাশবাণী থেকে প্রদত্ত এক ভাষণে আম্বেদকর তাঁর ব্যক্তিগত জীবন দর্শন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব জীবন দর্শন থাকা উচিত। নিজের আচার-আচরণের পরিমাপের মানদণ্ড হিসাবে। এই প্রসঙ্গে তিনি ভাগবদ গীতার বক্তব্য অনুসারে সাংখ্য দর্শনের 'ত্রিগুণ' তত্ত্বের সমালোচনা করে বলেন যে, তাঁর মতে এটা হল কপিলের দর্শনের এক নিষ্ঠুর অপব্যাখ্যা যার ফলে উদ্ভূত হয়েছে জাতি-প্রথা।

আম্বেদকরের সমাজ দর্শন ছিল তিনটি শব্দের ভিত্তিতে গঠিত —মুক্তি, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব। তবে তাঁর ঐ দর্শন ফরাসী বিপ্লবের মুক্তি মন্ত্র বলে কেউ যেন মনে না করেন, কারণ সেক্ষেত্রে ওটা ছিল রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত, আম্বেদকরের ক্ষেত্রে ধর্মের অঙ্গ, যা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর গুরু বুদ্ধদেবের শিক্ষা থেকে। আইনের সাহায্যে এগুলিকে প্রয়োগ করা যায় না। আম্বেদকর আরও বলেন যে, ভারতবাসীরা দুটি ভিন্নধর্মী মতাদর্শ নিয়ে চলছে। তাদের রাজনৈতিক আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে সংবিধানের প্রস্তাবনায়, যেখানে বলা আছে সাম্য, মুক্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের কথা, অথচ তাদের ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী যে সামাজিক আদর্শ মেনে চলে তা সংবিধানের ঐ কথাগুলির সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, বেশির ভাগ ভারতীয়ের যেটা রাজনৈতিক ভাবাদর্শ সেটাই যেন সকল ভারতীয়ের পক্ষে সামাজিক আদর্শ হয়ে ওঠে অর্থাৎ সাম্য, মুক্তি ও সৌভ্রাতৃত্বই হওয়া উচিত প্রতিটি ভারতবাসীর মূলমন্ত্র।

তাঁর এই সব কথাবার্তা ও জীবন দর্শনই প্রমাণ করছিল

আম্বেদকর ক্রমশঃ অভিজ্ঞ ও পরিণত হয়ে উঠছিলেন বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। ১৯৫৪ সাল, আম্বেদকরের বয়েস তখন ৬৩। ভগ্ন-স্বাস্থ্য, রণক্লান্ত ঐ যোদ্ধা এবার ভাবতে শুরু করলেন কী ফসল তিনি ফলাতে পেরেছেন এতদিনের কর্মযজ্ঞের ফলে। তাঁর অন্নহীন, বস্ত্রহীন, ভূমিহীন কোটি কোটি দলিত ভাই-বোনেদের জীবনে তেমন কোনো সুদিন কি তিনি সত্যিই আনতে পেরেছেন ? কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের যে অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল দলিতদের তাই করতে হয়েছে, কিন্তু সাহেবদের কাছে নিগ্রোরা অস্পৃশ্য ছিল না, বাড়ীতে চাকর-বাকরের কাজে তাদের নিয়োগ করা হত, কিন্তু দলিতদের ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে চাইত না উচ্চবর্ণের মানুষেরা। মিশরে ইজরায়লীরা, আমেরিকায় নিগ্রোরা, জার্মানীতে ইহুদীরাও ভারতের দলিতদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল এই কারণে যে ভারতীয় দলিত সম্প্রদায়ের মানুষজন স্বদেশেই ঐ ভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে।

গত আড়াই হাজার বছরের মধ্যে এই প্রথম দলিতরা একজন দলিত-নেতাকে পেয়েছিল তাদের ত্রাণকর্তা হিসাবে। তাঁর ঐ মরণপণ সংগ্রামের ফলেই দলিতরা সংবিধানের মাধ্যমে বেশ কিছু অধিকার পেয়েছে। অত্যাচারিত হতে হতে দলিত সমাজ হারিয়ে বসেছিল তাদের নৈতিক বল এবং হয়ে উঠেছিল মানবতাবোধ শূন্য। এই ধরনের এক মৃত সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন করে প্রাণ-সঞ্চার করেছিলেন আম্বেদকর। আর কিছু পান বা না পান দলিত বা বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে রাজনৈতিক সমানাধিকার তো পেয়েই ছিল। কিন্তু তার চেয়েও বড় কাজ যেটা আম্বেদকর করতে পেরেছিলেন তা এই— দরিদ্র, অশিক্ষিত, সহায়-সম্বলহীন ৬ কোটি দলিত সমাজের মানুষকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য খৃষ্টান মিশনারী ও মুসলমান মৌলভীরা এদের ধর্মান্তরিত করার জন্য সব রকম চেষ্টা চালিয়ে চলেছিল—তাদের ঐ অভিসন্ধি পূরণ করতে দেন নি আম্বেদকর—এটাই তাঁর

অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব।

সংবিধানের মাধ্যমে আইনগত অধিকার পেয়ে দলিত সমাজ ক্রমশঃ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে তুলতে শুরু করেছে তখন। কিন্তু অস্পৃশ্যতা তখনও বর্তমান ছিল সমাজে। সবাই মুখে অনেক কিছু বললেও কার্যক্ষেত্রে অযথা কালক্ষেপ করছিলেন চূড়ান্তভাবে এর নিষ্পত্তি করার জন্য—এঁদের উদ্দেশ্যে আম্বেদকর এক নিগ্রো কন্যার কাহিনী শুনিয়েছিলেন—মেয়েটিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল অত্যাচারী হিটলারকে সে কি শাস্তি দিতে চায়—তার উত্তরে সে বলেছিল—"ওকে নিগ্রো করে দিয়ে আমেরিকায় পাঠিয়ে দাও।"

আম্বেদকরের সঙ্গে দলিত সমাজের মুক্তির ব্যাপারে আর একজন অক্লান্ত পরিশ্রমী সেনাপতির নাম উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে—তিনি হলেন বীর সাভারকর। তিনিও বারবার বলতেন যে, হিন্দুরা যদি এই সর্বগ্রাসী অস্পৃশ্যতাবোধকে নির্মূল না করে তবে একদিন তারাই ভারতের সর্বনাশের কারণ হয়ে উঠবে। সাভারকর মনে করতেন অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ যে-কোনো বড় যুদ্ধ-জয় করার চেয়েও বড় সাফল্য।

শুধু অর্থনৈতিক নয়, সামাজিক বৈষম্য দূর না করলে অস্পৃশ্যতার বন্ধন-মোচন সম্ভব নয়। আমেরিকার ডঃ জে. এইচ. হোমস্ একবার বোম্বাইতে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, তাঁদের দেশেও প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ অস্পৃশ্য ছিল, কিন্তু আইন করে তা রদ করা হয়েছে এবং দাস প্রথারও অবলুপ্তি ঘটানো হয়েছে। আম্বেদকর তাঁর দীর্ঘ জীবনের সংগ্রামে একটা জিনিষই চাইতেন, তা হল অস্পৃশ্যদের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধকে জাগ্রত করা। অতএব অস্পৃশ্যদের উচিত বর্তমানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা না করে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য একাগ্র চিত্তে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

ঈশ্বরচিন্তা ও ভক্তিবাদ মানুষকে আফিমের মত আচ্ছন্ন করে

রাখে। নিজের অসহায় অবস্থাকে নীরবে মেনে নিতে শেখায়। কিন্তু না, মানুষ যেন ভাগ্যের দোহাই দিয়ে নিস্পৃহ হয়ে বসে না থাকে, বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা ভাবালুতাকে বিসর্জন দিয়ে লৌহমনা মানুষের মত নিজের ভাগ্যকে জয় করার জন্য সংগ্রামী হয়ে ওঠে—কারণ বসুন্ধরা বীরভোগ্যা। অন্নচিন্তার পাশাপাশি তাই অগ্রাধিকার দিতে হবে সংস্কৃতিমনস্ক হয়ে ওঠার জন্য।

এই দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই আম্বেদকরকে নবজাগরণের প্রধান পুরোহিত আখ্যা দেওয়া হয়। হিন্দুত্ববাদের নবজাগরণ হয় উপনিষদের যুগে, তারপর স্বার্থান্বেষী উচ্চবর্ণের মানুষের চক্রান্তে আবার ফিরে আসে ঈশ্বরতত্ত্ব, পুরোহিতবাদ ও বলিদান প্রথা। তারপর সমাজের আভ্যন্তরীণ চাপেই হোক বা প্রাকৃতিক নিয়মেই হোক আবির্ভাব হল বুদ্ধদেবের। তিনি সমাজকে পুরোহিতদের নিষ্ঠুর প্রথাগুলির হাত থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ালেন।

শংকরাচার্যের আবির্ভাবে হিন্দুত্ববাদ বৌদ্ধধর্মের নীতিগুলিকে আত্মসাৎ করে জাতিপ্রথা ও কর্মকাণ্ডের ফাঁস আবার জড়িয়ে দিল নিম্নবর্ণের গলায়।

তৃতীয় দফায় পরিবর্তন আনলেন রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য প্রভৃতিরা। নবজাগরণের চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা পেলাম রামমোহন রায়, মহাত্মা ফুলে, রাণাডে, দয়ানন্দ সরস্বতী এবং স্বামী বিবেকানন্দকে—এঁদের আদর্শবোধকে কার্যকর রূপে প্রয়োগ করতে এগিয়ে এলেন বীর সাভারকর। গান্ধীজীও যে কিছু করেন নি, তা নয়,—তবে তাঁর অবদান ছিল মানবিকতার ভিত্তিতে, সামাজিক দিকে নয়। হিন্দুত্ববাদের নবজাগরণ ও হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা পাই বিপ্লবী নেতা আম্বেদকরকে। নিজে দলিত হয়ে দলিত বর্গের প্রথম সার্থক সমাজ-সংস্কারক নেতা হিসাবে অমর হয়ে থাকবেন আম্বেদকর।

তিনি যে কত দূরদর্শী ছিলেন তার আর একটা পরিচয় ভাষা

সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত। ভাষার বন্ধন সেই ভ্রাতৃত্বকে দৃঢ়তর করে—এর জন্য আম্বেদকর দাবী করেছিলেন হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করা হোক এবং নাগরী হোক জাতীয় বর্ণমালা। এক ভাষায় চিন্তা করতে শুরু করলে মনের বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

ষোড়শ পর্ব

খুব ছোটবেলায় বুদ্ধদেবের জীবনী সংক্রান্ত গ্রন্থটি উপহার পেয়েছিলেন আম্বেদকর। তাঁর ধর্ম ও বাণী সম্ভবতঃ তখন থেকেই প্রভাবিত করতে শুরু করেছিল দলিত সমাজের ভাবী নেতাকে।

১৯৫0 সাল থেকে খোলাখুলি ভাবে আম্বেদকরকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে লাগল বৌদ্ধধর্ম। অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করলে অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এ নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা করতে করতে অবশেষে বুদ্ধের শরণ নেওয়াই ঠিক করলেন তিনি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ভারতীয় সমাজকে যদি সাম্য ও ন্যায়নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তবে বুদ্ধ-দেবের নির্দেশিত পথ অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

১৯৫৪ সালে ডিসেম্বর মাসে আম্বেদকর তাঁর স্ত্রী ও ব্যক্তিগত সেক্রেটারীকে নিয়ে রেঙ্গুন গেলেন তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলনে যোগ দিতে। কিন্তু মানবজাতির একনিষ্ঠ প্রেমিক হিসাবে তিনি কখনোই বুদ্ধিপ্রসূত যুক্তিকে বিসর্জন দেন নি। ঐ সম্মেলনের জাঁকজমক দেখে তিনি প্রসন্ন হতে না পেরে বলেই ফেলেছিলেন—এই ধরনের রাজকীয় সমারোহে যে অর্থের অপব্যয় হচ্ছে তার একটা অংশ ব্যয় করা উচিত বুদ্ধদেবের বাণী সাধারণ মানুষদের কাছে পৌঁছে দেবার কাজে। বৌদ্ধধর্মের মূল কথা সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, এর ব্যতিক্রম দেখতে ভাল লাগে না। অবশ্য তার সঙ্গে একথাও বলেন যে, ভারতীয় সংবিধানের মূল স্রষ্টা হিসাবে তিনি জাতীয় পতাকায়

বৌদ্ধধর্মের ধর্মচক্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে ভগবান বুদ্ধকে ভারতীয়দের হৃদয়ে চিরস্থায়ী স্থান করিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। এমনকি বুদ্ধদেবের জন্মদিনকে ভারতে সাধারণ ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করাটা সম্ভব হয়েছে আম্বেদকরের চেষ্টাতেই।

রেঙ্গুন থেকে ফেরার পর পুণার কাছে দেহু রোডে এক বৌদ্ধ-বিহার তৈরী করিয়ে সেখানে একটি বৌদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা তিনি এনেছিলেন রেঙ্গুন থেকে। মূর্তি প্রতিষ্ঠার দিনে বিশাল এক জনতার সামনে তিনি ঘোষণা করেন বুদ্ধদেব সম্পর্কে একটা বই লিখছেন, তা শেষ হলেই বৌদ্ধধর্ম আনুষ্ঠানিক ভাবে তিনি গ্রহণ করবেন।

ডঃ আম্বেদকরের মত এক বিশাল ব্যক্তিত্ব বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করবেন একথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। কলকাতার মহাবোধি সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ডি. বলিসিনা উষ্ণ অভিনন্দন জানালেন আম্বেদকরকে।

জাপানের 'আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সংস্হার' কর্মকর্তা ডঃ ফেলিক্স বলি আম্বেদকরকে জাপান সাংস্কৃতিক সংস্হার গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। পরে আম্বেদকরের অনুরোধে ডঃ ফেলিক্স ভারতে এসে বৌদ্ধধর্ম চর্চা ও প্রসারের ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করেন। সেই আলোচনার সূত্র ধরে আম্বেদকর ঘোষণা করেন বাঙ্গালোরে একটি বৌদ্ধ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্হাপন করবেন। ১৯৫৪ সালে মহীশূরের রাজা তাঁকে ৫ একর জমি দান করেছিলেন, তিনি আর্থিক সাহায্য করারও প্রতিশ্রুতি দিলেন (নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে এক সয়ম্ভর বিদ্যাশিক্ষা কেন্দ্র গঠন করাই ছিল আম্বেদকরের স্বপ্ন।

এই সময়ে আম্বেদকরের স্বাস্হ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। দেহের ওজন কমে যায় মারাত্মক ভাবে, হাঁটাচলা প্রায় বন্ধ, শ্বাস-কষ্ট এতই বেশি যে বাড়ীতে সব সময়ে অক্সিজেন সিলিণ্ডার রাখা থাকত। নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তিনি দ্রুত তাঁর হাতের

কাজগুলি শেষ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত গ্রন্থটি শেষ করা দরকার অনতিবিলম্বে। এ ছাড়া 'ভারতে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব', 'বুদ্ধ অথবা কার্ল মার্কস' ও 'হিন্দুধর্মের কূট প্রশ্ন' নামের বই রচনাতেও হাত দিয়েছিলেন।

১৯৫৬ সালের প্রথম দিকে আম্বেদকর তাঁর রচিত 'বুদ্ধদেব ও তাঁর বাণী'র টাইপ করা প্রতিলিপি পাঠাতে শুরু করেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের কাছে তাঁদের মতামতের জন্য। তারপর ২৪শে মে বুদ্ধ জয়ন্তী উৎসবে আম্বেদকর ঘোষণা করেন আগামী অক্টোবর মাসে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করবেন।

স্বাস্থ্য দ্রুত খারাপ হয়ে আসছিল আম্বেদকরের। ২৩শে সেপ্টেম্বর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তিনি ঘোষণা করলেন পরবর্তী ১৪ই অক্টোবর দুর্গাপূজার বিজয়া দশমীর দিন তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করবেন। স্থান নির্দ্ধারিত হয়েছিল নাগপুর শহর। আম্বেদকর দীক্ষা নিতে চাইলেন ভারতের প্রবীণতম বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ভিক্ষু চন্দ্রমণির কাছ থেকে। সেই সঙ্গে এটাও ঘোষণা করলেন ঐ দিন যাঁরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হবেন, তাঁরাও যেন তৈরী হয়ে আসেন।

এত জায়গা থাকতে নাগপুরকে বেছে নেওয়ার পিছনে একটা বিশেষ যুক্তি ছিল। শত শত বছর আগে এই নাগপুর ছিল বৌদ্ধদের এক মহান পীঠস্থান। শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ পণ্ডিত নাগার্জুন বাস করতেন এখানে।

কয়েকদিন আগেই আম্বেদকর চলে আসেন এখানে। নাগপুর মেতে ওঠে উৎসবের সাজে। লক্ষ লক্ষ আম্বেদকর অনুরাগীদের ভীড়ে নাগপুর তখন নতুন করে ফিরে পেল তার গৌরবময় ঐতিহ্য। চার একর জমির ওপর তৈরী হল দীঘাভূমি। নারী-পুরুষদের জন্য আলাদা আচ্ছাদিত মঞ্চ। মাঝখানে সাঁচি স্তুপের বিশাল প্রতিরূপ।

দীক্ষার আগের দিন অর্থাৎ ১৩ই অক্টোবর সাংবাদিক সম্মেলনে

ঘোষণা করলেন আম্বেদকর তাঁর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের তাৎপর্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। তিনি বৌদ্ধধর্মের হীনযান বা মহাযান কোনো মতকেই গ্রহণ না করে এক নতুন মত অর্থাৎ 'নবযান'কে প্রাধান্য দেবেন। যার ভিত্তি হল সমাজ জীবনের সার্বিক কল্যাণ-সাধন। তাঁর মতে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মূলগত তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তিনি আশা প্রকাশ করেন ভবিষ্যতে সবাই একদিন এই ধর্ম গ্রহণ করবে এবং একমাত্র তখনই ভারতে প্রতিষ্ঠিত হবে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ।

তারপর এল সেই বহু প্রতীক্ষিত শুভ লগ্নটি। ১৪ই অক্টোবর সকালে শ্বেত বস্ত্র পরিধান করে সস্ত্রীক আম্বেদকর সঙ্গে তাঁর একান্ত সচিব এন. সি. রত্তুকে নিয়ে পৌঁছলেন দীঘাভূমিতে। উল্লাসে ফেটে পড়ল লক্ষ লক্ষ আম্বেদকর-প্রেমিকেরা।

মারাঠী ভাষায় রচিত আম্বেদকর—প্রশস্তিসূচক একটি গান দিয়ে শুরু হল অনুষ্ঠান। ঐ দিনটি ছিল আম্বেদকরের শ্রদ্ধেয় পিতৃদেবের মৃত্যুবার্ষিকী। এক মিনিট নীরবতা পালন করার পর ৮২ বছরের বৃদ্ধ ভিক্ষু মহাস্থবির চন্দ্রমণি পালি ভাষায় দীক্ষা দিলেন আম্বেদকর ও তাঁর স্ত্রী সারদাকে। তাঁর আহ্বানে সেদিন তিন লক্ষ দলিত শ্রেণীর মানুষ গণদীক্ষা নিয়ে বৌদ্ধ হলেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি ভাষণ দিতে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিশরণ—অর্থাৎ বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ এবং পঞ্চশীলের আদর্শ মেনে চলার উপদেশ দিলেন। হত্যা, চুরি, মিথ্যা ভাষণ, ব্যাভিচার ও মদ্যপান না করতে বললেন তাঁদের। ১৯৩৫ সালে ডঃ আম্বেদকর যে শপথ নিয়েছিলেন সেদিন তা পূর্ণ হল—'আমি অস্পৃশ্য হয়ে জন্মেছি, তবে অস্পৃশ্য হয়ে মরবো না'—।

পরের দিন ১৫ই অক্টোবর ঐ দীঘাভূমিতেই আরও এক লক্ষ মানুষ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলেন। এই ঘটনার পর ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রী, কলকাতা থেকে অধ্যাপক অরবিন্দ বড়ুয়া, কলম্বো থেকে এইচ. ডবলু. অমর সূর্য অভিনন্দন জানালেন ডঃ ভীমরাও

রামজী আম্বেদকরকে। আশ্চর্যের ব্যাপারে এই যে ভারতের কোনো হিন্দু বিদগ্ধ ব্যক্তি আম্বেদকরকে অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে আসেন নি, উল্টে সব সংবাদপত্রে কঠোর ভাষায় সমালোচনা হল আম্বেদকরের।

নব দীক্ষিত আম্বেদকর চেয়েছিলেন সারা ভারত ঘুরে তিনি তাঁর ধর্মের কথা প্রচার করবেন, কিন্তু স্বাস্থ্য এতই খারাপ হয়ে উঠেছিল যে তাঁর সে উদ্দেশ্য সফল হয় নি।

১৯৫৬ সালে ১৫ই নভেম্বর নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে ৪র্থ বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলনে তিনি গিয়েছিলেন স্ত্রীকে নিয়ে। সেখানে প্রদত্ত এক বিশ্লেষণাত্মক ভাষণে তিনি প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন যে মার্কসবাদের চেয়ে বৌদ্ধধর্ম অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ব্যাপারে এটাই ছিল আম্বেদকরের শেষ অংশগ্রহণ।

ভারতের বর্ণহিন্দুদের মধ্যে এই ধর্মান্তরিতকরণের যত সমালোচনাই হোক না কেন আম্বেদকর তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। কিন্তু তার সবচেয়ে গুরুতর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল খোদ তফসিলী সমাজের উপর। কয়েক হাজার বছর ধরে হিন্দুধর্মের ছত্রছায়ায় থাকতে থাকতে দলিত শ্রেণীর মানুষেরা অন্য কিছুকে সহজে স্বীকার করে নিতে পারছিল না। তাদের সংস্কারে প্রচণ্ড আঘাত এল, এবং এল কিনা তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা আম্বেদকরেরই কাছ থেকে। যুক্তি যতই জোরালো হোক না কেন, চিরায়ত সংস্কারকে তা ভাঙ্গতে পারে না সহজে।

ধর্মের নামে স্বার্থান্বেষী মানুষেরা সমাজকে খণ্ড খণ্ড করে, মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে যে শাসন ও শোষণ চলছিল তার বিরুদ্ধে প্রথম সার্থক বিদ্রোহ করেন কপিলবাস্তু নগরের এক রাজপুত্র, নাম সিদ্ধার্থ। তিনি প্রচার করেছিলেন প্রজ্ঞা, করুণা ও সমতার বাণী। এই সব কারণে আম্বেদকর আনুষ্ঠানিক ভাবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁর মতে এটাকে ধর্মান্তরন না বলে,

বলা উচিত স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন।

আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে আম্বেদকর বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। কিন্তু সাংবিধানিক আইন থাকা সত্ত্বেও দলিত সমাজের মানুষেরা আজও বর্ণহিন্দুদের কাছ থেকে পেয়ে আসছে নির্যাতন, বঞ্চনা ও ঘৃণা। শুভবুদ্ধির উদয় ঘটেনি। ধর্মের আশ্রয় পেয়েও না।

সপ্তদশ পর্ব

দল যত বড় হয়, যত বেশি ক্ষমতা হাতে আসে ততই বাড়ে তার আভ্যন্তরীণ সমস্যা। আম্বেদকরদের তফসিলী ফেডারেশনের ক্ষেত্রেও সেটা সত্য প্রমাণিত হতে লাগল।

১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচন এবং ১৯৫৪ সালের উপ-নির্বাচনে ফেডারেশনের প্রার্থীদের পরাজয়ের ব্যাপারটা বেশ ভাবিত করে তুলল নেতৃবৃন্দকে। ওদিকে নেতাদের নিজেদের মধ্যে মনো-মালিন্য প্রকট হয়ে উঠছিল। আম্বেদকরের দ্বিতীয় বিবাহ এবং বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের পরিকল্পনা অনেকেই ভাল চোখে যে নেন নি সেটা ক্রমশঃ সুপরিস্ফুট হয়ে উঠছিল। বিশেষ করে সারদা কবীরের সঙ্গে বিবাহের ফলে আম্বেদকর তাঁর স্বভাবজাত অন্তর্দৃষ্টি ও ব্যক্তিগত জ্ঞান-বুদ্ধির ভাণ্ডার দলের কাজে আগের মতো লাগাতে পারছেন না এরকম একটা অভিযোগ দানা পাকিয়ে উঠছিল। এর অবশ্য একটা কারণ ছিল—আম্বেদকরের একমাত্র পুত্র যশবন্তের সঙ্গে তাঁর সৎ-মায়ের সম্পর্ক তেমন ভাল না থাকায় অনেকে অনুমান করে নিচ্ছিলেন যে আম্বেদকর মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত।

এসব কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে আম্বেদকর কিন্তু নিজের কাজ করে চলেছিলেন অক্লান্ত ভাবে। এর আগে তাঁর দাঁত তোলা হয়ে গেছে। ডায়াবিটিস্ তো ছিলই। শ্বাসকষ্ট বেড়েছিল। ডাক্তারের পরামর্শে বিদেশী খাবারও খেতে হচ্ছিল তাঁকে, এমন কি ডাক্তারের চাপে পড়ে শীতকালে সামান্য ব্র্যাণ্ডি ও গ্রীষ্মকালে সামান্য পরিমাণ বীয়ার খেতেও তাঁকে হয়েছিল।

এরই মধ্যে ফেডারেশনের ভবিষ্যৎ ভেবে ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডাকা হল ১৯৫৪ সালের ২৭শে আগস্ট। ঐ সভায় এক বিচিত্র প্রস্তাব পাশ করা হয়—কেবলমাত্র সরকারী, বেসরকারী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া তফসিলীদের জন্য সংসদ, বিধানসভা, বিধান্ পরিষদ ও লোকাল বোর্ডে আসন সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা আছে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে তার আর প্রয়োজন নেই। সুতরাং শেষোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হোক। নির্বাচনগুলিতে বিশ্রীভাবে হারার ফলে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা করছিলেন নেতারা। স্বাস্থ্যের কারণেই হোক বা চারপাশে উচ্চাকাঙ্খী ফন্দিবাজ লোকেদের ভীড়ের জন্যই হোক এই সময় আম্বেদকর কয়েকটা ভুল কাজ করে বসেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বেদনাদায়ক হল, দীর্ঘদিনের বিশ্বাসভাজন অনুগত সঙ্গী ও সচিব কমলাকান্ত চিত্রের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ।

ঐ সভায় আম্বেদকরের আর এক অতি বিশ্বস্ত অনুগামী দলের অন্যতম নেতা পি. এন. রাজভোজ সরাসরি অভিযোগ আনেন যে ডাঃ সারদা কবীরকে বিয়ে করার পর থেকে আম্বেদকর কোনো এক অজ্ঞাত কারণে দলের পুরানো প্রবীণ নেতাদের ব্যাপারে সন্দেহ করা শুরু করেছেন। ফলে রাজভোজের পক্ষে দলের হয়ে কাজ করা আর সম্ভব হচ্ছে না। আম্বেদকর বাধ্য হয়ে রাজাভাউ খোবরা গারেকে দলের সম্পাদক করলেন। এখানেই শেষ নয়, পরে এন. শিবরাজও অভিযোগ আনলেন যে তিনি আম্বেদকরের গুণমুগ্ধ অনুগত হওয়া সত্ত্বেও দলের নেতৃত্ব থেকে অপসারিত করা হয়েছে তাঁকে।

দলের মধ্যে যখন এইভাবে চাপা ক্ষোভ ধুমায়িত হয়ে উঠছে, তখন পরবর্তী নির্বাচন প্রায় আসন্ন। ১৯৫৭ সালের নির্বাচন বেশ গুরুত্বপূর্ণ হবে, এতে আম্বেদকরকে কিছু একটা ইতিবাচক ফল দেখাতেই হবে। এই নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে গিয়ে আম্বেদকর দেখলেন, দেশ বিভাজন ইত্যাদির ফলে দলিত সম্প্রদায়ের সংখ্যা আগের জনসংখ্যার তুলনায় এক পঞ্চমাংশ থেকে কমে এক ষষ্ঠমাংশ হয়ে গেছে। তফসিলী ফেডারেশন যদি শুধু তার নিজের সম্প্রদায়ের ভোটের ওপর নির্ভর করে তবে এবারও ফল আগের মত

হবে। রাজনৈতিক দল হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হলে দেশের বৃহত্তম সংখ্যক জনগণকেও ঐক্যবদ্ধ করে তাদের স্বার্থে দলকে শক্তিশালী করা দরকার। অতএব ফেডারেশনকে এমন ভাবে গঠন করতে হবে যাতে অনুন্নত শ্রেণীর বাইরে যারা আছে তাদের সমর্থনও পাওয়া যায়, তা না করলে শাসন ক্ষমতায় অধিকার পাকা করা যাবে না।

দীর্ঘ ত্রিশ বছরের সংগ্রামের পর তিনি দলিত সমাজকে রাজনৈতিক অধিকার পাইয়ে দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সমাজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে আরও বেশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার অর্জন করা প্রয়োজন। আর তা করতে হলে আরও শক্তিশালী ও ব্যাপকতর সংগ্রাম করতে হবে, আর তার জন্য চাই আরও বড় দল, যার মধ্যে শুধু দলিত নয়, অন্যান্য অনুন্নত ও বঞ্চিত মানুষদেরও টেনে নিতে হবে।

দলিতরা ছাড়াও সমাজে তখন আরও বড় জনগোষ্ঠী আছে, বিশেষ করে শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী শ্রেণীর মানুষ, যারা দলিতদেরই মতো সামাজিক শোষণ ও বঞ্চনার শিকার, তাদের সাহায্য দরকার। তফসিলীদের সঙ্গে এদের যুক্ত করলে তাদের সংখ্যা দাঁড়াবে মোট জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশ। অতএব শুধু দলিত শ্রেণী নয়; ভারতের শোষিত ও বঞ্চিতদের মুক্তির জন্যও সংগ্রাম আশু প্রয়োজন। নিজের পূর্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে আম্বেদকর দেখেছিলেন যে শ্রমিক-কৃষকদের কল্যাণের নামে সোসালিস্ট, কম্যুনিস্ট পার্টির নেতারা এদের ব্যবহার করেছেন শুধু নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য। প্রকৃত অর্থে শ্রমিক-কৃষকের তেমন কোনো উন্নতিই হয় নি। তাই এমন একটি দল গড়তে হবে, যার মধ্যে শুধু তফসিলীদের না রেখে, দেশের অনুরূপভাবে বঞ্চিত মানুষদেরও সদস্য করা যাবে। আর তখনই জন্ম নিল রিপাবলিকান পার্টি।

এই নতুন পার্টির আদর্শ, লক্ষ্য ও কর্মপন্থা কি হবে তার জন্য যুবশক্তিকে আগে থাকতে প্রস্তুত করার কথা চিন্তা করলেন আম্বেদকর। অনতিবিলম্বে সিদ্ধার্থ কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রী এস. এ. রিজ-এর তত্ত্বাবধানে 'রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ স্কুল' নামে

একটি শিক্ষাগার স্থাপন করার কথা ভাবলেও শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবে রূপায়িত হয় নি।

রিপাবলিকান পার্টিতে সেই সব বঞ্চিতদের যোগদানের আহ্বান জানালেন যারা দলিত সমাজের নিরক্ষর শ্রমিক-কৃষক এবং অন্য সমাজেরও অনুরূপ জনগণকে। এই পার্টিতে একমাত্র তাদেরই স্থান হবে যারা সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার নীতিতে বিশ্বাসী। আর তাদের নিয়েই লড়বেন আগামী নির্বাচন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্রুত কাজ করছিলেন আম্বেদকর, কিন্তু তখনও জানতেন না যে তাঁর স্বপ্নের স্বার্থক রূপায়ণ তিনি দেখে যেতে পারবেন না। মৃত্যুর দুদিন আগে ১৯৫৬ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তিনি কংগ্রেস বিরোধী দুই মহারাষ্ট্রীয় নেতা আচার্য পি. কে. আত্রে ও এস. এম. জোশীকে আহ্বান জানালেন রিপাবলিকান পার্টিতে যোগ দিতে। কিন্তু তার আগেই মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ঐ মহাপ্রাণকে।

শ্রদ্ধেয় নেতার সম্মানার্থে তাঁর শেষ ইচ্ছাকে পূর্ণ করার জন্য তাঁর অনুগামীরা ভারতীয় রিপাবলিকান পার্টি গঠন করলেন ও ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে অংশও নিলেন। দলের নেতা হলেন আম্বেদকরের সার্থক অনুগামী ভাউরাও গাইকোয়াড যিনি পরে দাদাসাহেব গাইকোয়াড নামে সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল পার্টির বাইরের কোনো নামকরা নেতা ওতে যোগদান না করায় রিপাবলিকান পার্টির মূল চরিত্রটি ফেডারেশনের মতই থেকে গেল। তবে এটা ঠিক যে এই রিপাবলিকান পার্টি কালক্রমে সর্ব-ভারতীয় রাজনৈতিক দলের মর্যাদা লাভ করে দীর্ঘদিন সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল ভারতের সর্বশ্রেণীর শোষিত ও বঞ্চিত মানুষদের অধিকার অর্জনের জন্য।

অষ্টাদশ পর্ব

কাঠমাণ্ডুতে বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলনে যোগ দেবার আগে অর্থ সংকটে পড়তে হয়েছিল আম্বেদকরকে। তাঁর "রাজগৃহ" বাড়ীর কাজের ব্যাপারে কনট্রাকটরের টাকা পাওনা ছিল। হাইকোর্টে আম্বেদকরের বিরুদ্ধে মামলা করে তারা, ফলে কষ্ট করে টাকা-জোগাড় করে তা জমা দেওয়ার পর পাটনা থেকে কাঠমাণ্ডু যান। সেখানে নেপালের হিন্দু শাসক রাজা মহেন্দ্র অভূতপূর্ব সম্মান দেখান আম্বেদকরকে। এমন কি গোঁড়া ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা পর্যন্ত বৌদ্ধদের পশুপতিনাথ মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি দেন।

কাঠমাণ্ডু থেকে ফেরার পর আম্বেদকরের স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি হতে লাগল। তখন আম্বেদকরের শ্বশুর, শালা ও ডঃ মবলঙ্কর চলে আসেন দিল্লীতে তাঁর দেখাশোনা করার জন্য। জ্ঞানী পণ্ডিত বেশ বুঝতে পারছিলেন তাঁর দিন আসন্ন হয়ে আসছে। এই সময় তিনি তাঁর সচিব এন. সি. রত্তুর উপর দারুণ ভাবে নির্ভরশীল হয়ে ওঠেন। জীবনের শেষের দিকে তিনি তাঁর আত্মীয় স্বজনের চেয়ে বেশি কাছে পেতে চাইতেন রত্তুকে।

১৯৫৬ সালের ৩০শে নভেম্বর দিল্লী ফিরলেন, এবং বিমানবন্দর থেকে বাড়ী যাবার পথে তাঁর প্রিয় কুকুরের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিলেন, যাকে কয়েকদিন আগে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

সেই হাসিখুশি আম্বেদকরকে আর যেন পাওয়া যাচ্ছিল না, কেমন যেন বিষণ্ণ, দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং মনের দিক থেকে অবসন্ন। ১লা ডিসেম্বরও তিনি মথুরা রোডে একটা একজিবিশন দেখতে গেলেন। ফেরার পথে কনট প্লেসের বইয়ের দোকানেও ঢুকেছিলেন আজীবন জ্ঞান তপস্বী আম্বেদকর।

২রা ডিসেম্বর দলাইলামার সম্মানার্থে আয়োজিত এক সভায় গেলেন অশোক বিহারে। সন্ধ্যেবেলায় বাড়ীর লনে বসে অনেকের সঙ্গে গল্প-গুজবও করেন। পরদিন সন্ধ্যেবেলা গ্রুপ ফটো তোলালেন, ফটো তুললেন তাঁর শালা বালু কবীর।

সন্ধ্যের পর এক হাতে লাঠি অন্য হাত রত্তুর কাঁধে রেখে

দেখতে গেলেন বাড়ীর বৃদ্ধ মালীকে, যে গত ৩/৪ দিন ধরে অসুস্থ ছিল। প্রভুকে ঐভাবে আসতে দেখে মালী অভিভূত। কাঁদতে কাঁদতে সে অনেক কথাই বলল, কিন্তু প্রত্যুত্তরে আম্বেদকর তাকে বলেছিলেন—'কান্না বন্ধ কর। সবাইকে একদিন মরতে হবে। মনে সাহস রাখ। ওষুধ পাঠাচ্ছি, খেয়ো, তুমি ভাল হয়ে যাবে।'

মালীর ঘর থেকে ফেরার সময় আম্বেদকর রত্তুকে বলেছিলেন—'বেচারা মৃত্যুভয়ে ভীত....আমি কিন্তু ভয় পাইনা....আসুক না মৃত্যু যে-কোনো সময়ে।'....

হায়, একথা বলার সময়েও আম্বেদকর বুঝতে পারেন নি যে মৃত্যু তাঁকে এখন অনুসরণ করে চলেছে।

১৬ই ডিসেম্বর আম্বেদকরের বোম্বাই যাবার কথা ছিল তাঁর কিছু অনুগামীর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ সংক্রান্ত উৎসব উপলক্ষ্যে। রত্তুকে টিকিট কাটার কথা মনে করিয়ে দিলেন।

তারপর কার্লমার্কসের দাস ক্যাপিটাল বইটা নিয়ে বসে পড়লেন 'বুদ্ধ ও কার্লমার্কস' নামের বইটা শেষ করতে। লেখা শেষ হলে পাণ্ডুলিপি তুলে দিলেন রত্তুর হাতে টাইপ করার জন্য।

৫ই ডিসেম্বর আম্বেদকর আবার বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ঘণ্টি বাজিয়ে তিনি খোঁজ করলেন স্ত্রীর, শ্রীমতী আম্বেদকর তখন কিছু কেনাকাটা করার জন্য ডঃ মবলঙ্কারের সঙ্গে বাজারে গিয়েছিলেন। বেশ কয়েকবার স্ত্রীর খোঁজ করে, না পেয়ে দারুণ রেগে গেলেন তিনি।

এদিকে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। রাঁধুনী সুদামা এসে ঘরে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। সন্ধ্যের সময় রত্তু এসে দেখলেন আম্বেদকরের মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীমতী আম্বেদকর ফিরলেন, কিন্তু স্বামীর মেজাজ চড়া দেখে রত্তুকে সামলাতে বললেন।

রাত ৮টা আন্দাজ কয়েকজন জৈন নেতা এলেন আম্বেদকরের সঙ্গে দেখা করতে। শরীর ও মন দুইই ভাল নেই, অথচ এঁদের ফিরিয়ে দেওয়াও যায় না। ভদ্রতার খাতিরে দেখা করলেন। জৈন নেতারা আম্বেদকরের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি জানালেন তাঁর শরীর ভাল নেই। ভাল থাকলে জৈন নেতাদের

আমন্ত্রণ অনুযায়ী পরদিন তাঁদের সভায় যাবেন এ প্রতিশ্রুতিও দিলেন।

জৈন নেতারা চলে যাবার পর রত্তু তাঁর সেবা করতে শুরু করলেন। পা টিপছিলেন, আম্বেদকর বললেন মাথায় তেল লাগাতে। তাতে একটু সুস্থ বোধ করলেন আম্বেদকর।

হঠাৎ রত্তুর কানে এল গানের সুর। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলেন আম্বেদকর গাইছেন 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'। তাঁর আদেশ অনুযায়ী রেডিয়োগ্রামে ঐ গানের রেকর্ডটা বাজান হল, আম্বেদকর চোখ বন্ধ করে গানের সুরে সুর মেলালেন।

রাত বাড়লে সামান্য একটু ভাত খেয়ে চেয়ারে বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। রত্তুকে বললেন মাথা টিপে দিতে।

এর পর শোবার পালা। শোবার ঘরে যেতে যেতে আম্বেদকর গুনগুন করে গাইতে লাগলেন—'চল কবীর তেরা, ভব সাগর ডেরা'।

কতকগুলো বই আগের থেকে এনে রাখা হয়েছিল। সেগুলি একের পর এক দেখার পর টেবিলের ওপর রাখলেন।

বিছানায় শুয়ে রত্তুকে পা টিপতে বললেন। রাত তখন প্রায় সওয়া এগারোটা। আগের রাত রত্তু বাড়ী ফিরতে পারেন নি। আম্বেদকরের চোখে ঘুম নেমে আসছে দেখে অনুমতি নিয়ে রত্তু বাড়ীর দিকে রওনা হবেন বলে সাইকেল নিয়ে বেরোতে যাবেন এমন সময় সুদামা গিয়ে তাঁকে বলল আম্বেদকর ডাকছেন।

আম্বেদকর তাঁকে বললেন, আলমারী থেকে 'বুদ্ধ ও তাঁর ধর্ম' বইটির মুখবন্ধ ও ভূমিকার টাইপ করা পাণ্ডুলিপি বের করে আনতে, সেই সঙ্গে আরও দু-তিনটি চিঠিও। সেগুলি টেবিলের পাশে রেখে চলে গেলেন রত্তু। আম্বেদকর রাতের মধ্যে ওগুলো দেখে রাখবেন। যথারীতি সুদামা ফ্লাস্ক ভর্তি কফি আর কিছু মিষ্টি রেখে গেল। তখনও কেউ, বিশেষ করে গত ৮ বছর ধরে অতন্দ্র প্রহরায় স্বামীর স্বাস্থ্যের দেখাশোনা করা ডাক্তার স্ত্রীও জানতেন না মৃত্যু আম্বেদকরের শিয়রে এসে গেছে।

১৯৫৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর সকালে স্ত্রী সারদা আম্বেদকর ঘুম থেকে উঠে স্বামীর ঘরে এলেন, তখন বাজে সকাল সাড়ে

ছ'টা। নিয়মমাফিক বাগানে এক চক্কর ঘুরে এসে স্বামীকে জাগাতে গিয়ে চমকে উঠলেন ডাক্তার সারদা আম্বেদকর। তিনি আর ইহ-জগতে নেই। তাড়াতাড়ি গাড়ী পাঠালেন রত্তুকে আনবার জন্য।

রত্তু এলেন, হাত-পা ঘষে, মুখে একটু ব্র্যাণ্ডিও দিলেন আম্বেদকরের। কিন্তু তার কোনো দরকার ছিল না। সোফার ওপর লুটিয়ে পড়ে সারদা কাঁদছিলেন অঝোরে—বাবাসাহেব আর নেই।

পরিস্থিতিটা ভাল ভাবে বুঝতে পেরে রত্তু লুটিয়ে পড়লেন আম্বেদকরের বুকে—কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন, 'বাবাসাহেব আমি এসেছি, কাজ দিন আমাকে।'

এরপর শুরু হল সবাইকে সেই হৃদয়-বিদারক খবরটা দেওয়া। বাবাসাহেবের নিকটজন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদেরও খবর দেওয়া হল। খবরটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল সারা দিল্লীতে।

দেখতে দেখতে আম্বেদকরের ২৬ নং আলিপুর রোডের বাড়ী লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। পণ্ডিত নেহেরু বিদেশীদের কাছে আম্বেদকরের পরিচয় দিতে গিয়ে বলতেন আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলীর অমূল্য রত্ন; তিনি ছুটে এলেন আম্বেদকরের বাসভবনে, উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলেন শ্রীমতী আম্বেদকরের খবর। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কি হচ্ছে তাও জানতে চাইলেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জগজীবনরাম প্রভৃতি বড় বড় নেতারাও এলেন শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। জগজীবনরাম ব্যবস্থা করে দিলেন প্লেনের যাতে আম্বেদকরের নশ্বর দেহ নিয়ে যাওয়া যায় বোম্বাইতে।

'বাবাসাহেব অমর রহে' ধ্বনি দিতে দিতে বিশাল মিছিল এগিয়ে চলল বিমানবন্দরের দিকে, সময় লাগল পুরো ৫ ঘণ্টা। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে, সাংসদদের এবং লোকসভা ও রাজ্য-সভার সচিবালয়, বিখ্যাত আইনজীবী, জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির তরফ থেকে ফুলের মালা দেওয়া হল তাঁকে। মৃতদেহের সঙ্গে গেলেন শ্রীমতী আম্বেদকর, শঙ্করানন্দ, ভিক্ষু আনন্দ কৌশল্যম, রত্তু, সুদামা ইত্যাদিরা।

রাজকীয় সমারোহে আম্বেদকরকে নিয়ে যাওয়া হল তাঁর বোম্বাইয়ের বাসভবন 'রাজগৃহে'। সারা বোম্বাই শহর শোকে

নিমগ্ন হল। ৭ই ডিসেম্বর বোম্বাই শহরের সব কল-কারখানা, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, দোকান-পাট, এমন কি সিনেমা হল পর্যন্ত বন্ধ রইল তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে। এ ছাড়া নাগপুর, শোলাপুর, আমেদাবাদেও পালিত হল হরতাল। শোক সইতে না পেরে অনেকে জ্ঞান পর্যন্ত হারিয়েছিলেন।

খোলা ট্রাকে ফুল মালায় শোভিত প্রিয় নেতাকে নিয়ে যাওয়া হল দাদরের হিন্দু শ্মশান ঘাটে। ইতিমধ্যে পুত্র যশবন্তও চলে এসেছেন।

এতবড় মিছিল বোম্বাই এর আগে কখনো দেখে নি। প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ যোগ দিয়েছিলেন ঐ শোক মিছিলে। শেষকৃত্য করলেন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় চিতায় আগুন দিলেন যশবন্ত। এই প্রথম বোম্বাইতে এক বেসরকারী মানুষকে পুলিশের তরফ থেকে বিগ্‌ল বাজিয়ে 'অন্তিম বিদায়' জানানো হয়েছিল। আম্বেদকরের ঐকান্তিক ইচ্ছাকে পূর্ণ রূপ দেবার জন্য ঐ শ্মশানেই প্রায় এক লক্ষ মানুষ বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নেন।

সকলেই পঞ্চমুখে প্রশংসা করলেন ঐ অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে মর্মস্পর্শী হয়েছিল আচার্য আত্রের বক্তৃতা, তাঁর কথায় পাঁচ লক্ষ মানুষ কেঁদে উঠেছিল একসঙ্গে। তাঁর শেষ কথা ছিল—আম্বেদকর সংগ্রাম করেছিলেন অন্যায়, নিপীড়ন আর অসাম্যের বিরুদ্ধে, তিনি কখনোই হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নি, চেয়েছিলেন হিন্দুধর্মের সংস্কার।

সারা দেশ, দলমত নির্বিশেষে সব রাজনৈতিক পার্টিগুলি এক সঙ্গে বলে উঠেছিলেন, ভারত হারাল তার এক শ্রেষ্ঠ সন্তানকে। লোকসভাতে নেহেরু বললেন, লোকে আম্বেদকরকে মনে রাখবে হিন্দু সমাজের নিপীড়নমূলক বৈশিষ্ট্যগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী বিদ্রোহী হিসাবে। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁকে বর্ণনা করলেন ভারতের সংবিধানের প্রধান স্থপতি হিসাবে, এবং তিনি যে সব বিষয়ের মধ্যে দলিত সমাজের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছিলেন মাথা উঁচু করে, ওটা আদৌ অত্যুক্তি নয়।

প্রায় সব সংবাদপত্র তাঁকে বর্ণনা করল ভারতের মহান সন্তান, মহান পণ্ডিত, আইন-বিশারদ, দক্ষ পার্লামেণ্টারিয়ান এবং

সংবিধান বিশেষজ্ঞ হিসাবে।

বিদেশের সংবাদপত্রও তাঁকে ভূষিত করল তুলনাহীন সম্মান দিয়ে। 'নিউইয়র্ক টাইমস' ও লণ্ডনের 'দ্য টাইমস' পত্রিকায় বলা হল তিনি অস্পৃশ্যদের নেতা হিসাবে অমর হয়ে থাকবেন, এবং ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস কোনো দিনও তাঁকে ভুলবে না। ভারতের বেশির ভাগ রাজনীতিবিদ্‌রা বললেন যে, আম্বেদকরের অকাল মৃত্যুতে বিশ্বের গণতন্ত্র দরিদ্রতর হল এবং হারাল তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রক্ষককে। দলিত সমাজের মুক্তি সংগ্রামের একক সেনাপতি ছিলেন আম্বেদকর, পৃথিবীর ইতিহাসে এটা একটা বিরল ঘটনা।

কাঠমাণ্ডুতে বুদ্ধ ও কার্লমার্কস সম্বন্ধে ভাষণ দিতে গিয়ে আম্বেদকর বলেছিলেন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে 'দুঃখ'কে সম্পদ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর তিনি প্রায়ই বলতেন যে তাঁর ভাগ্য যেন কখনো লোকমান্য তিলকের মতো না হয় এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তাঁর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীরা যেন আদালতের দ্বারস্থ না হয়। অথচ সেটাই ঘটেছিল তাঁর কপালে।

আম্বেদকরের মৃত্যুর এগারো দিন পরে তাঁর অনুগামীরা দিল্লীতে এক শোকসভার আয়োজন করেন এবং তাতে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে আম্বেদকরের মৃত্যুর ব্যাপারে তদন্ত দাবী করেন। অনুগামীদের সন্দেহ ছিল আম্বেদকরকে ধীরে ধীরে বিষ প্রয়োগ করে মারা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশী তদন্ত করা হয়, এবং দিল্লীর পুলিশ তাদের প্রতিবেদনে জানায় যে আম্বেদকরের মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছে।

এখানেই শেষ নয়, সম্পত্তির অধিকার নিয়ে আম্বেদকরের স্ত্রী সারদা ও পুত্র যশবন্তের মধ্যে মামলাও চলেছিল, দীর্ঘকাল পরে অবশ্য আপোষ মীমাংসায় তা মিটে যায়।

মহারাষ্ট্র সরকারের মুখ্যমন্ত্রী যশবন্তরাও চৌহান জনগণের অভিমত অনুসারে আম্বেদকরের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে ছুটি ঘোষণা করেন এবং নাগপুরের দীক্ষাস্থলে এগারো একর জমি দান করেন, সেই সঙ্গে দাদরের শ্মশানঘাটে কিছুটা জমি দেন যেখানে আম্বেদকরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়েছিল।

আম্বেদকরের বহুচর্চিত বিশাল গ্রন্থ 'বুদ্ধ ও তাঁর ধর্ম' একাধারে প্রশংসা ও নিন্দা দুইই কুড়িয়েছিল। অনেকের মতে গ্রন্থটিতে আম্বেদকর নৈর্ব্যক্তিক হতে পারেন নি, নিজের দর্শনের আলোকে বৌদ্ধ দর্শনের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, যা করেছিলেন তিলক 'গীতা' সম্পর্কে।

ভারতের বৌদ্ধদের বিখ্যাত পত্রিকা 'মহাবোধি'তে বিরূপ সমালোচনা করা হয় গ্রন্থটির, এবং বলা হয় এটি একটি বিপজ্জনক রচনা—আম্বেদকর যে বৌদ্ধধর্মের কথা বলেছেন তার ভিত্তিভূমি হল ঘৃণা এবং বুদ্ধদেবের ধর্মের মূল কথা হল করুণা। বর্ণ-হিন্দুরাও আম্বেদকরের বিরুদ্ধে এই ঘৃণার অভিযোগ এনেছিল অনেক আগেই। তার উত্তরে আম্বেদকর গোলটেবিল বৈঠকে বলেছিলেন 'আমার মনে যদি ঘৃণা ও প্রতিহিংসার ভাব থাকত, তবে পাঁচ বছরের মধ্যে এই দেশে বিপর্যয় ঘটিয়ে দিতে পারতাম।' আম্বেদকরের জীবনের ইতিহাস মানুষকে মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দেবার অক্লান্ত, অকুতোভয় সংগ্রামের ইতিহাস।

রাজপ্রাসাদ এবং পর্ণকুটির থেকে বহু মহান ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে ঠিকই ; ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে চর্মকার, দরজী, কসাই, কামারের পরিবারের অনেক ভাগ্যবান ব্যক্তি পৃথিবীতে যশস্বী হয়েছেন, কিন্তু এঁদের কারুর সঙ্গেই আম্বেদকরের তুলনা হতে পারে না, কারণ তিনি উঠে এসেছেন ধূলি-ধূসরিত এক অজ্ঞাত, ঘৃণিত, অত্যাচারিত পরিবার থেকে, যার পূর্বপুরুষরা হাজার হাজার বছর ধরে নিজেদের দেশেই জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও অধম জীবন যাপন করেছে, যাদের স্পর্শ করা দূরে থাক ছায়া পর্যন্ত মাড়ালে অশুচি হয়ে যেত উন্নত শ্রেণী বলে দাবী করা মানুষেরা।

এক সময়ে তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন যদি দলিত সমাজকে তাদের দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিতে না পারি তবে একটি বুলেট দিয়ে নিজের জীবনের অবসান ঘটিয়ে দেব। আইনগতভাবে আম্বেদকর তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'ভারতভূষণ' আম্বেদকর আগামী বহু প্রজন্মের কাছে শোষিত ও বঞ্চিতদের মুক্তিদাতা 'মোজেস' হয়ে থাকবেন।

ঊনবিংশ পর্ব

বিশেষণ দিয়ে মানুষকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করা যায়। অষ্টোত্তরী শতনামের মালা পরে দেব-দেবীরা যেমন বিশেষিত হয়ে আছেন ডঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকরও সেই ভাবে বিশিষ্ট হয়ে থাকবেন।

দেশ-বিদেশের মানুষ আম্বেদকরকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। পণ্ডিত, বাগ্মী, ব্যবহারজীবী, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক, আইন-বিশারদ, দলিতদের নেতা, সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতা, দক্ষ পার্লামেণ্টারিয়ান, সংবিধান বিশেষজ্ঞ, কূটনীতিবিদ, আধুনিক মনু, চাণক্য, জ্ঞানতপস্বী, সুলেখক, সুচতুর যোদ্ধা, পরম ধার্মিক, সৎচরিত্র, ন্যায়পরায়ণ ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত এই বিরল ব্যক্তিত্বকে কেউ কেউ আবার বৃটিশ বুলডগও বলতেন, সরোজিনী নাইডু তাঁকে মুসোলিনীও বলেছিলেন।

মানুষ আম্বেদকরকে জানতে হলে আরও একটু বিশদে যাওয়া যাক। পুরুষের রূপ বলতে যদি তার ব্যক্তিত্বকে বোঝায় তবে একথা অকপটে বলা যায় প্রকৃত অর্থে রূপবান ছিলেন আম্বেদকর।

পাঁচ ফিট সাত ইঞ্চি লম্বা বলিষ্ঠ, সুগঠিত চেহারার এই মানুষটির ওজন ছিল ১৮০ পাউণ্ড। প্রশস্ত ললাট ও উন্নত চিবুক ছিল তাঁর মানসিক দৃঢ়তার পরিচায়ক। মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত থাকত গাম্ভীর্যের উজ্জ্বল দ্যুতিতে। উদ্ধত নাসিকা যেন ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সাগরে ভাসমান জাহাজের মাস্তুল। প্রাণবন্ত উজ্জ্বল অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ছিল চোখ দুটিতে। রেগে গেলে সেখান থেকে হত অগ্নিবৃষ্টি। অস্পৃশ্যতাজনিত ঘৃণায় অধরোষ্ঠ হয়ে উঠত জ্বলন্ত অঙ্গার। তিনি যেন আর এক যমদগ্নি। আবার যখন প্রসন্ন অবস্থায় থাকতেন তখন মনে হত তিনি যেন এক আলোক-স্তম্ভ, পথহারাকে আশ্রয়ের আশ্বাস সেখানে জাজ্বল্যমান।

তাঁর স্বভাব ছিল ঘূর্ণিঝড়ের মত। সামান্য ব্যাপারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন, আবার পরমুহূর্তেই শান্ত সমুদ্রের মত। পারিবারিক জীবনে গৃহস্থ বলতে যা বোঝায় তিনি তা আদৌ ছিলেন না। তিনি নিজেকে 'অসঙ্গ' বলতেন, অর্থাৎ সঙ্গীসাথীহীন মানুষ। তাঁর

জীবনের অধিকাংশ সময় কেটে গেছে অধ্যয়নে, জনঃসংযোগে এবং ঝড়ের মত ঘুরে বেড়াতেন সভাসমিতিতে যোগ দেবার জন্য। কর্মই ছিল তাঁর জীবনের ধর্ম, এমন কি একমাত্র পুত্রের বিয়েতেও তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন নি।

মহাপুরুষদের চরিত্র সাধারণত হয়ে থাকে বজ্রাদপি কঠোর ও কুসুমোচিত কোমল, এবং আম্বেদকর তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বহির্মুখী জীবন সত্ত্বেও এই নিরলস সংগ্রামীকর্মী তাঁর অনুগামী ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি ঠিক মতো নজর রাখতেন। মাত্রাতিরিক্ত অন্তরঙ্গতা না দেখালেও, প্রয়োজনে ঠিক পাশে এসে দাঁড়াতেন। তাঁকে আমরা দেখেছি কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুতে বালকের মত কাঁদতে। পোষা কুকুরের মৃত্যুতেও তিনি পুত্রহারা জননীর মত কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। অসুস্থ বৃদ্ধ মালির প্রতিও সজাগ দৃষ্টি ছিল। রাঁধুনী সুদামাকেও খুব ভালবাসতেন।

দরিদ্র, দুঃস্থ মানুষদের প্রতি তাঁর মমতা ছিল অপরিসীম। একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য—একবার এক দরিদ্র রমণী দুপুর দুটোর সময় এসে কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে জানায় যে শত চেষ্টাতেও সে তার অসুস্থ স্বামীকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে পারেনি। কালবিলম্ব না করে নিজের গাড়ীতে করে অসুস্থ ব্যক্তিটিকে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে আসেন। ব্যারিস্টার হিসাবে অনেক দরিদ্র মানুষের মামলা তিনি বিনা পারিশ্রমিকেও করেছিলেন।

ব্যক্তিজীবনে তাঁর সততা ছিল ভয়ংকর রকমের উগ্র। তিনি ছিলেন সত্যের মতোই রূঢ়। বিদেশে বহুদিন কাটানো সত্ত্বেও তিনি মদ্যপান বা ধূমপান করতেন না। খাওয়ার ব্যাপারে আদৌ খুঁতখুঁতে ছিলেন না, যা পেতেন তাই খেতেন। তাঁর প্রাণশক্তি ছিল অফুরন্ত বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো। তাঁর আত্মবিশ্বাস মাঝে মাঝে গর্বের পর্যায়ে গিয়ে পড়ত।

অবসর সময়ে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে যেতে পারতেন। খুব জোরে শব্দ করে হাসতেন। রসবোধ ছিল অত্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর, কিন্তু তৎসত্ত্বেও গ্রাম্য ভাষা ও গ্রাম্য রসিকতা করতে বাধতো না তাঁর।

সদাব্যস্ত আম্বেদকর জীবনের শেষের দিকে সঙ্গীতপ্রেমিক হয়ে

ওঠেন এবং বেহালা শিখতে শুরু করেন। চার্চিলের মত অবসর সময়ে ছবি আঁকতেও শুরু করেছিলেন। ভাল ছবি ও সুন্দর স্থাপত্য শিল্প তাঁকে আকৃষ্ট করত প্রবলভাবে।

অস্পৃশ্য সমাজে জন্মালেও মেজাজে ছিলেন সাহেব। অবসর সময়ে ধুতির লুঙ্গী ও সার্ট পরলেও এমনিতে তিনি বিলিতি পোষাকের ভক্ত ছিলেন এবং বেশ দামী স্যুটও তিনি পরতেন। দামী জুতো, ভাল গাড়ী, অসংখ্য পেন ছিল তাঁর। দামী দামী দুর্লভ ছবিও ছিল তাঁর সংগ্রহে।

অবশ্যই দলিত সমাজের জন্য সংগ্রাম করা বাদে, সবচেয়ে প্রিয় বস্তু ছিল বই। তাঁর লাইব্রেরী ছিল অনেকের ঈর্ষার বস্তু। আবার অত ব্যস্ততার মধ্যে সিনেমাও দেখতেন।

'আঙ্কল টম' সিনেমা দেখেছিলেন প্রথমা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। বোম্বে টকীজের অস্পৃশ্যতা বিষয়ক তৎকালীন সাড়া জাগানো চলচ্চিত্র 'অচ্ছুৎ কন্যা' দেখে তিনি চোখের জল চেপে রাখতে পারেন নি। দ্বিতীয়া স্ত্রীকে নিয়েও দেখেছিলেন চার্লস ডিকেন্সের উপন্যাসের সার্থক চিত্রায়ণ 'অলিভার টুইস্ট'। অত্যাচারিত বঞ্চিতদের কাহিনী তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করত। স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে তাঁকে ক্রিকেট খেলতেও দেখা গেছে। নিজে ভাল রান্না করতে পারলেও, কখনো পছন্দমত খাবারের কথা বলতেন না। বেশির ভাগ সময় লাইব্রেরীতে বসেই খাওয়াটা সেরে ফেলতেন। আর রেগে গেলে পাথরের মূর্তির মতো বসে থাকতেন, হাজার অনুরোধ করলেও খেতেন না। দীর্ঘদিনব্যাপী সংগ্রাম-পদ-দলিতদের জন্য আত্মিক-ব্যাকুলতা এবং নানা ধরনের অসুখ সত্ত্বেও আম্বেদকরের মুখে-চোখে তার কোনো প্রতিফল হত না, সব সময়ে তিনি সূর্যের ভাস্বরতায় উজ্জ্বল থাকতেন। অ্যাপেনডিসাইটিস, ব্লাড প্রেসার তো কষ্ট দিতই, তার ওপর একটু পরিণত বয়সে দেখা দিয়েছিল ডায়াবেটিস। পায়ের শিরার ব্যথা ইলেকট্রিক চিকিৎসায় সাময়িক আরাম দিত।

১৯৫৩ সালে আওরঙ্গাবাদে থাকাকালীন আম্বেদকর কোনো সাক্ষাৎ প্রার্থীর সঙ্গে দেখা করতেন না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তাঁরা কলেজের বিশাল পতিত জমিতে একটা গাছ পুঁতে আসতেন।

এইভাবে কলেজের চৌহদ্দীর মধ্যে শত শত গাছ পোঁতা হয়ে যায়। তিনি যে প্রকৃতি-প্রেমিক ছিলেন, সেই সঙ্গে পরিবেশ সচেতন এই ঘটনা তারই প্রমাণ। একবার মাহাদে থাকাকালীন একটা হোস্টেলের চৌহদ্দী পরিষ্কার করার জন্য সঙ্গীসাথীদের নিয়ে নিজেই যন্ত্রপাতি ঘাড়ে নেমে পড়েছিলেন।

পাণ্ডিত্যের ব্যাপারে তাঁর এমনই খ্যাতি ছিল যে তাঁকে বলা হত জীবন্ত জাদুঘর। যে-কোনো প্রসঙ্গে আলোচনা করার সময় তিনি প্রচণ্ড ভাবে উদ্দীপিত হয়ে উঠতেন, বাচনভঙ্গী ছিল অপরূপ আর কণ্ঠস্বরে ছিল অপূর্ব জাদু। যখন যে বিষয়ের বর্ণনা দিতেন, তখন শ্রোতার মনে হত তিনি যেন সেখানে পৌঁছে গেছেন।

ব্যক্তি জীবনে নিয়ম মেনে চলাতে তিনি ভালবাসতেন, শ্রমমন্ত্রী হবার আগে পর্যন্ত ভোরের দিকে কয়েক ঘণ্টা মাত্র ঘুমিয়ে উঠে পড়তেন, সামান্য ব্যায়াম করে, স্নান সেরে নিতেন। জলখাবার খেয়ে চোখ বোলাতেন খবরের কাগজে। তারপর সামান্য খেয়ে চলে যেতেন কোর্টে। মাঝে মাঝে দুপুরের খাওয়াটা সেরে নিতেন কোনো হোটেলে। গাড়ী করে কোর্টে যাবার সময় সদ্য কেনা বইয়ের মধ্যে ডুবে যেতেন। ফেরার পথে বইয়ের দোকানে ঢোকা ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কাজ। রাতের খাওয়া তাড়াতাড়ি সেরে বসে পড়তেন বই নিয়ে, কখন উঠবেন কেউ বলতে পারত না। আম্বেদকর যখন বই পড়তেন, তখন এমন তন্ময় হয়ে যেতেন যে, সামনে কেউ বসে আছে সেটা পর্যন্ত ভুলে যেতেন।

পৃথিবীর সব বিখ্যাত ব্যক্তিরাই সময় সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন থাকতেন। নেপোলিয়ানের কাছে সময়ই ছিল সব কিছু। বিখ্যাত শিল্পপতির কাছে সময় মানেই অর্থ। কিন্তু আম্বেদকরের কাছে সময় বলতে বোঝাতো জ্ঞান। আমাদের যুগের দুজন বিখ্যাত ভারতীয় জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করেছেন, একজন হলেন গান্ধীজী, অপরজন আম্বেদকর।

রাজনীতির আঙ্গিনায় এমন অনেক মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, যাদের যাওয়া উচিত ছিল ভিন্নপথে। কিন্তু দেশ ও দেশের মানুষের বিরুদ্ধে অন্যায়-অবিচার হচ্ছে দেখে স্বেচ্ছায় তাঁরা জড়িয়ে পড়েছেন রাজনীতির আবর্তে। যেমন লোকমান্য তিলক, তিনি

বলতেন যে স্বাধীন ভারতে গণিতের অধ্যাপক হবার ইচ্ছা আছে তাঁর। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে সক্রিয় রাজনীতিতে চলে আসেন। সেই রকম আম্বেদকরেরও হওয়া উচিত ছিল জ্ঞান তপস্বী পণ্ডিত অধ্যাপক, কিন্তু অস্পৃশ্যদের দুঃখ সহ্য করতে না পেরে শুরু করলেন রাজনীতি। বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত ডঃ জনসন বলতেন তিনি কখনো কোনো বইয়ের মলাট থেকে মলাট অর্থাৎ যা লেখা আছে সবকিছু পড়েন না, অন্যেরাও পড়েন বলে বিশ্বাস হয় না তাঁর। ব্যতিক্রম কিন্তু আম্বেদকর, তিনি বইয়ের মলাটের রঙ, কোন্ অধ্যায়ে কি আছে তাও বলতে পারতেন একবার পড়ার পরে। পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য এক সময়ে আম্বেদকরের লাইব্রেরী ২ লাখ টাকায় কিনতে চেয়েছিলেন, বাবাসাহেব জানিয়ে দিয়েছিলেন প্রাণ দিতে পারি, লাইব্রেরী না। তবে ডঃ জনসন যেমন উদারভাবে যে-কেউ চাইত তাকে বই ধার দিতেন, আম্বেদকর সে বিষয়ে খুব কড়া ছিলেন।

কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, এই আম্বেদকরই তাঁর সাধের ল্যাইব্রেরী দিয়ে দিচ্ছেন সিদ্ধার্থ কলেজকে, বিড়লা যে দাম দিতে চাইছিলেন তার অর্দ্ধেক দামে। তারপর দিল্লীর আলিপুর রোডের বাড়ীতে আবার নতুন করে গড়ে উঠতে লাগল লাইব্রেরী।

আম্বেদকরের জীবনে তিনজন মহাপুরুষের প্রভাব পড়েছিল। শিশুকাল থেকে শোনা রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী ও চরিত্রগুলি তাঁর জীবনে গভীর ভাবে রেখাপাতও করেছিল। আর মানুষদেহ-ধারী তিন ব্যক্তিকে তিনি পূজা করতেন, প্রথম জন বুদ্ধদেব, দ্বিতীয় কবীর এবং তৃতীয় জন মহাত্মা ফুলে। এরা আম্বেদকরকে দিয়ে ছিলেন-আত্মিক শক্তি, পাশ্চাত্য শিক্ষা তাঁকে দিয়েছিল সেই শক্তি প্রয়োগ করার শাণিত অস্ত্র। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, সি. ভি. রমণের রে'জ এফেক্ট, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের বিজ্ঞান গবেষণা, সত্যেন বসুর উদ্ভিদের শারীরবৃত্ত, রাধাকৃষ্ণাণের দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থও ছিল আম্বেদকরের জীবনের পরম সম্পদ। তখনকার দিনে তিন শ্রেণীর রাজনীতিবিদ ছিলেন। প্রথম শ্রেণী হল পণ্ডিত-রাজনীতিবিদ, দ্বিতীয় আইনজ্ঞ-রাজনীতিবিদ, আর দ্রুত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠা তৃতীয় শ্রেণীটি ছিল সংগ্রামী-রাজনীতিবিদ

যাদের সঙ্গে আঁতাত ছিল মুনাফাখোর রাজনীতিবিদদের। আম্বেদকর ছিলেন প্রথম শ্রেণীর, যাঁদের সংখ্যা দ্রুত কমে আসছিল। তিলক ছিলেন এই শ্রেণীর অগ্রদূত। তবে তিলকের চেয়ে অনেক বেশি সংগ্রাম করতে হয়েছিল আম্বেদকরকে এবং বহু কটু সমালোচনাও ছিল তাঁর অঙ্গের ভূষণ।

বক্তা হিসাবে এডমান্ড বার্কের সঙ্গে তুলনীয় আদৌ না হলেও, মঞ্চ থেকে বা সংসদে যখন বক্তৃতা দিতেন আম্বেদকর, তখন তাঁর সহজ-সরল, তীক্ষ্ণ অথচ প্রাঞ্জল ভাষার প্রয়োগে সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতো।

মহৎ সংকল্প ও দৃঢ় চরিত্র নিয়ে যখন কোনো নেতার আবির্ভাব হয় তখন তাঁর পূজক ও নিন্দুকের অভাব হয় না। একদিকে যখন তাঁর চরিত্রের সততার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হচ্ছে মানুষ, অন্যদিকে তাঁর কয়েকটি দুর্বলতা নিয়ে ব্যঙ্গও করা হচ্ছে। তাঁর চরিত্রের সেই রকমই একটা দুর্বলতা ছিল লোকেদের পাওনা টাকা মিটিয়ে দেবার ব্যাপারে অযথা কৃপণতা। কেউ পাওনা টাকা চাইতে এলেই তিনি সরাসরি বলতেন দেওয়া হয়ে গেছে। সমালোচকরা বলত যে ব্যক্তি পূজা পেতে পেতে অত্যন্ত অহংকারী হয়ে উঠেছিলেন তিনি। দলে তাঁর কথাই ছিল শেষ কথা, কেউ তাঁর কোনো সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করলে চটে যেতেন আম্বেদকর।

তাঁর অনুগামীরা যে তাঁকে দেবতার আসনে বসিয়ে রেখেছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে একটি ঘটনা তাঁর চরিত্রের একটি বিচিত্র দিককেও প্রকাশ করে। তিনি একবার আদেশ দিয়েছিলেন দলিত সমাজের মানুষজন যেন হিন্দু দেব-দেবীদের পূজা না করে। অনুগামীরা তা অক্ষরে অক্ষরে মেনেও চলত। কিন্তু যুগ-যুগান্ত ধরে মানুষ যা মেনে এসেছে, সামান্য মুখের কথায় তা হঠাৎ ফেলে দেয় কি করে। তাছাড়া অজ্ঞানতা জন্ম দেয় ভীতির। ঐসব দলিতরা ছিল বেশির ভাগই নিরক্ষর তাই তাদের ঈশ্বর ভীতি একেবারে মুছে যায় নি মন থেকে। একবার এক বৃদ্ধ আম্বেদকরভক্ত তাঁর কাছে গিয়ে করজোড়ে অনুমতি চান গণেশ মূর্তি এনে পূজা করার, কারণ এটা ছিল তাঁর বহুদিনের মানৎ। আম্বেদকর জোরে হেসে উঠে বলেছিলেন, 'কে বলেছে যে আমি

ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না! যাও, যা প্রাণ চায় করো।'

আর একটি দৃষ্টান্ত—এক কংগ্রেসী মন্ত্রী আম্বেদকরের এক অনুগামীকে পাহারাদারের চাকরী দেন। এই চাকরীপ্রার্থীর ছেলে তার বাবাকে এর জন্য ভীষণ বকাবকি করে। ফলে ঐ বৃদ্ধ ফিরে গিয়ে মন্ত্রীকে বলে—যে তাঁর চাকরী চাই না। কারণ খবরটা পেলে তাদের "রাজা" ক্ষুব্ধ হবেন।

হিন্দুদের পরমপ্রিয় গীতা কিন্তু আম্বেদকরের কাছে ছিল অস্পৃশ্য। যদিও তিনি ধর্মে বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে ক্ষুধার্ত মানুষ আইনের ভয়ে চুরি করে না একথা সত্য নয়, তার হৃদয়ের ধর্মভাবই তাকে চুরি করতে নিষেধ করে। তিনি বলতেন, ধর্ম হৃদয়ের ব্যাপার, ন্যায়নীতি আইনের অঙ্গ।

আম্বেদকরকে কেউ অধার্মিক বলতে পারে না। মনে প্রাণে তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ, কিন্তু অজ্ঞানতাপ্রসূত ধর্মভীরুতা ছিল না তাঁর মধ্যে। তিনি বিশ্বাস করতেন এক অজ্ঞেয় শক্তি মানুষের অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর একটা উদাহরণ তাঁর জীবনেই আছে—একবার গ্রামাঞ্চলে একটা পুলের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর মোটর গাড়ী প্রায় তলার নদীতে পড়ে যাচ্ছিল। সামনের চাকা দুটি শূন্যে ভাসছে, পেছনের চাকা দুটি আটকে পড়েছে একটা বড় পাথরে। গাড়ীটা দুলছে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত। ড্রাইভার আর আম্বেদকর দ্রুত নেমে পড়েন গাড়ী থেকে। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে এভাবে প্রাণ বাঁচাবার জন্য ঊর্ধ্বমুখী হয়ে প্রার্থনা করে-ছিলেন তিনি।

আম্বেদকর বিশ্বাস করতেন যে, ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ও এক-নিষ্ঠতা না থাকলে মানুষ সৎ ও সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করতে অসমর্থ হবে। ন্যায়নীতি ও আদর্শকে মেনে চলতে হলে ধর্মীয় নির্দেশের প্রতি নিষ্ঠা থাকা একান্তভাবে প্রয়োজন। তিনি প্রায়শই একথা বলতেন যে যদি তাঁর মধ্যে কোনো কিছু মহৎ থেকে থাকে তবে তা তিনি পেয়েছেন ধর্মীয় নির্দেশ থেকে। এর সঙ্গে একথাও মনে করিয়ে দিতেন যে আচরণীয় ধর্মকে অবশ্যই হতে হবে যুক্তি নির্ভর ও ন্যায়নিষ্ঠ যুক্তিহীন আচারসর্বস্ব আচরণকে ধর্ম আখ্যা দেওয়া যায় না। ধর্মগ্রন্থগুলিতে বা প্রচলিত ধর্মাচরণের

বিধিনিয়মে যে-ধর্ম বিষয়ের কথা বলা হয়ে থাকে সেই ধরনের ধর্মে আম্বেদকর বিশ্বাস করতেন না, গতানুগতিকতার বা প্রাত্যহিকতার শৃঙ্খলে নিজেকে বেঁধে রাখতে চাননি বলেই হয়ত অনেকে তাঁকে ধর্ম-বিরোধী বলেছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আম্বেদকরের ধর্ম-চিন্তা ছিল বৈপ্লবিক।

মূলতঃ মহারাষ্ট্রের দলিত সমাজের একজন অত্যাচারিত সদস্য হয়ে সংগ্রাম করলেও তিনি ক্রমশঃ হয়ে উঠেছিলেন সর্বভারতীয় নেতা। তাঁর মধ্যে প্রাদেশিকতার সংকীর্ণতা ছিল না। কিন্তু মাঝে মাঝে মহারাষ্ট্রের অধিবাসীদের জন্য গর্ব প্রকাশ করতে দেখা যেত। স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক আগে মোগল-পাঠানদের যুগে মহারাষ্ট্রীয়দের সংগ্রামের কথা বলতে গিয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। এমন কি বোম্বাই সহ আলাদা মহারাষ্ট্র রাজ্যের দাবীতেও তিনি সোচ্চার হন।

উদারপন্থী রাজনীতিজ্ঞরা প্রভাবিত করতেন সমাজের উচ্চ-শ্রেণীকে। তিলকই প্রথম ভারতীয় নেতা যিনি মধ্যবিত্তদের কথা চিন্তা করেছিলেন। প্রকৃত অর্থে জনগণের নেতা ছিলেন মহাত্মা গান্ধী; আম্বেদকরও তাই, তবে তাঁর প্রধানতঃ প্রভাব ছিল দলিত সমাজের উপর। তিলক, গান্ধী, নেহেরু, সাভারকর ও সুভাষচন্দ্রের মত আম্বেদকরও সারা দেশ ঘুরে ঘুরে নিজের বক্তব্য শোনাতেন। তিনি বিশেষ কোনো সংগঠনের প্রতিভূ হিসাবে কাজ করতে চাইতেন না, তাঁর লক্ষ্য ছিল এক মহান আদর্শকে ফলবতী করা। তিনি একটা কথা প্রায়ই বলতেন যে জনগণের খামখেয়াল অনুযায়ী চলা উচিত নয় নেতাদের। নেতার উচিত অত্যন্ত বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে অনুগামীদের মুক্তির প্রকৃত পথনির্দেশ দেওয়া।

আধুনিক যুগে সংগঠন চালাবার যে প্রচলিত পদ্ধতি ছিল সেটা মেনে চলতেন না আম্বেদকর। পৃথক ব্যক্তিনির্ভর সংগঠনও তাঁর পছন্দ হত না। তাই তিনি যে দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তার কোনো নিয়মিত বাৎসরিক সম্মেলন বা সাধারণ রীতি মাফিক সভা-সমিতি ডাকা হত না। যখনই যেখানে প্রয়োজন পড়েছে তিনি আলোচনায় বসে পড়তে দ্বিধা করেন নি। মতলবী মানুষদের উপচক্র বা সংবাদ-পত্রের উদ্দেশ্যমূলক নিন্দা-প্রশস্তিতে তাঁর ঘোরতর আপত্তি ছিল।

হাতের লেখা দেখে নাকি মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করা যায়। তাই যদি সত্যি হয় তবে আম্বেদকরের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটি সবচেয়ে ভালভাবে প্রযোজ্য হবে। তাঁর হাতের লেখা ছিল ভারী সুন্দর। অক্ষর ও পংক্তির নিজস্ব ভঙ্গী থেকে বোঝা যায় তাঁর মানসিক দৃঢ়তা, নিপুণতা এবং স্বচ্ছতার ভাবটি। মননশীল মানুষের চারিত্রিক শৃঙ্খলাবোধ ও চিন্তার পরিপক্কতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁর লিখনশৈলী, এবং এ ব্যাপারে আম্বেদকর তাঁর উৎকর্ষের প্রমাণ রেখে গেছেন।

জাতীয় সংহতির প্রশ্নে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন আম্বেদকর। সমস্ত হিন্দু সমাজকে সাম্য-মৈত্রীর বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করা ও তাকে নতুন করে আধুনিক সমাজের উপযোগী করে গঠন করতে চেয়েছিলেন আম্বেদকর (জাতি-বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র হিন্দু জাতিকে এক এবং অভিন্ন সমাজ-বিধির আওতায় আনার জন্যই তিনি কঠোর পরিশ্রম করে রচনা করেছিলেন হিন্দু কোড বিল। সমাজে নারী ও পুরুষের অবদানকে যৌথ সম্মান দিয়ে তিনি তাদের সমান অধিকার দিয়েছিলেন বদ্ধপরিকর। বৈদিক যুগে নারী-পুরুষ যে অধিকার ও সম্মান পেত, ঠিক সেই অবস্থাই ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন আম্বেদকর। পরবর্তীকালের জাতি-প্রথা ও পুরোহিত তন্ত্রের শোষণ ও তাদের নির্দেশিত নাগপাশের বন্ধন থেকেও মুক্ত করতে চেয়েছিলেন হিন্দু সমাজকে।

প্রধানত, দলিত সমাজের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য সংগ্রাম করলেও যখনই দেশের স্বার্থে প্রয়োজন হয়েছে তিনি তাঁর ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়েছেন তার বহু প্রমাণ ছড়িয়ে আছে তাঁর জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে।

বিংশতি পর্ব

দেশ স্বাধীন হয়েছে ৪৮ বছর আগে। বিদেশী শাসনমুক্ত ভারত যথেষ্ট সময় পেয়েছে দেশকে গড়ে নেবার। বহু ক্ষেত্রে ভারতের প্রগতি যে হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু দারিদ্র-সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা এখনও ভীতিপ্রদ। এমন কি 'বাবাসাহেব' যাদের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন সেই দলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও যথেষ্ট ক্ষোভের কারণ থেকে গেছে। গত দুই-এক দশকের ইতিহাসে দৃষ্টি দিলে সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মণ্ডল কমিশনের রায় কার্যকর করতে গিয়ে প্রতিবাদী আত্ম-হননের ঘটনাগুলি নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয় আম্বেদকরের স্বাধীনোত্তর ভারতীয় সমাজে খুব একটা পরিবর্তন ঘটে নি। ক্ষমতালিপ্সু রাজনীতিবিদরা ক্ষুদ্র স্বার্থে এখনও ভাঙ্গিয়ে খাচ্ছে জাত-পাতের দ্বন্দ্বের কুফলটিকে। আম্বেদকরের নামে রাস্তা, স্টেডিয়াম, মূর্তি স্থাপন করেই কেবলমাত্র তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো যায় না। সরকারী চাকরীতে সংরক্ষণ নীতি নিয়ে বাড়াবাড়ি করেও অনেক নেতা রাজনৈতিক ফায়দা লুটছে। জাতপাতের অবলুপ্তি কাগজে-কলমে ঘটলেও, এবং শিক্ষা বিস্তারের ফলে জাতিভেদ প্রথা অনেকে সাহসের সঙ্গে না মানলেও, এখনও যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা ক্যান্সারের মত যে-কোনো দিন মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

জাত-পাতের ভিত্তিতে বৈষম্য দূর করার আইনগত সব ব্যবস্থা করে যাওয়ার জন্য ব্রাহ্মণেতর সব জাতের মানুষ ও তার আগামী প্রজন্মের উচিত আম্বেদকরের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা।

মন্দিরে প্রবেশের অধিকার আজ সবাই পেয়েছে। যে-সব মন্দিরে ব্রহ্মণ্যবাদের দাপটে অনাচার চলত, সে-সব ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণও আজ সম্ভব হয়েছে।

বেশির ভাগ শিক্ষিত মানুষের ধারণা আমাদের ধর্ম বেদ-ভিত্তিক। কিন্তু বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বেদ পড়লে দেখা যাবে যে বেদ আইনের উৎস নয় এবং কখনো উৎস ছিলও না। প্রথা-ভিত্তিক আইন রচিত হয় স্মৃতি ও নিবন্ধের ভিত্তিতে, আর এদের

স্রষ্টারা বেদের নামের সঙ্গে জড়িত করে আইনগুলিকে ধর্মীয় মর্যাদা দিতে চেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে স্মৃতিগুলিই হল দেওয়ানী বিধি বা ব্যবহার শাস্ত্রের জনক।

মনু স্পষ্ট বলেছেন, 'বেদ পাঠ করে নি এমন দ্বিজ যদি অন্য কোনো বৃত্তি অবলম্বন করে তবে সে জীবদ্দশাতেই শূদ্রের পর্যায়ে নেমে আসবে।' শূদ্রের হাতে রান্না করা খাদ্যগ্রহণ ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ হলেও, শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করায় বাধা ছিল না। এই আইনও ব্রাহ্মণের তৈরী। এমন কি সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করার মধ্যেও ব্রাহ্মণদের এক গভীর উদ্দেশ্য ছিল। সেই সময় ভারতের নিকটবর্তী দেশগুলিতে হয় মুসলমান নয় বৌদ্ধরা বাস করত, তাই হিন্দুরা দেশের বাইরে যেতে পারবে না।

এই গূঢ় অভিসন্ধি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণরা ক্ষমতাশালী উচ্চবর্ণের সহায়তায় নিম্নবর্ণকে পদদলিত করে রাখার মূলে ছিল। আম্বেদকর বিরোধীতা করেন ঐ চক্রান্তের বিরুদ্ধে। তিনি কতটা সফল হয়েছিলেন তা একটি মামলার আলোচনার মাধ্যমে পরিস্ফুট।

মামলাটি জনৈক মথুরা আহির করেছিলেন কৃষ্ণা সিং-এর বিরুদ্ধে। আহির পদবী থেকে সহজেই বোঝা যায় মথুরা গোয়ালা বংশের সন্তান।

কাহিনীঃ মথুরা আহির সংসার ত্যাগ করে 'সন্ত মৎ' নামে এক ধর্ম-সম্প্রদায়ের মোহন্ত স্বামী আত্মাবিবেকানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী.হন। দীক্ষাগুরুর মৃত্যুর পর মথুরা মোহন্ত পদে অভিষিক্ত হন। এবং ঐ পদাধিকারে তিনি ২ থেকে ৫ নং প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে উচ্ছেদের মামলা করলেন এই অভিযোগ এনে যে ২ নং প্রতিবাদী বিবাদাধীন বাড়ীটি প্রয়াত মোহন্ত আত্মাবিবেকানন্দের কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছিল এবং অবৈধভাবে দর-ইজারা (সাব-লেট) দেয় ৩ থেকে ৫নং প্রতিবাদীদের। এবং এই প্রতিবাদীরা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এটাও দাবী করে যে বাড়ীটি ছিল মোহন্ত আত্মা-বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নিজ পুত্র, কৃষ্ণা সিং-এ বর্তাচ্ছে। অতএব ভাড়াটে উচ্ছেদের মামলাটিকে খাস দখলের মামলায় রূপান্তরিত করা হোক, এবং তার মালিকানা

দেওয়া হোক মোহন্ত পুত্র কৃষ্ণা সিং-কে পক্ষভুক্ত করে। এইভাবে পক্ষভুক্ত হয়ে অন্যান্য প্রতিবাদীদের সুরে সুর মিলিয়ে কৃষ্ণা সিং দাবী জানাল যে বিবাদীয় বাড়ীটি ছিল তার পিতৃদেব আত্মা-বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, এবং কোনো ভাবেই তা মঠের সম্পত্তি হতে পারে না। সেই সঙ্গে একথাও বলা হয়েছিল যে মথুরা আহির, জন্মসূত্রে শূদ্র হওয়ায় আইনগতভাবে সন্ন্যাসী হতে পারে না, আর সেই কারণেই মোহন্ত হবার অধিকারীও নয়। মূল আদালতে মথুরা আহির জেতে, এবং তার আপীল-মামলাতেও ট্রায়াল কোর্টের রায় বহাল থাকে। কৃষ্ণা সিং শেষে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আপীল করে, সেখানে বিচারপতি কীর্তি আপীল খারিজ করে দেন।

শূদ্র হওয়ার ফলে মথুরা আহির সন্ন্যাস নিতে পারে কিনা এই প্রশ্নের বিচার করতে গিয়ে বিচারপতি বলেছিলেন—কালপ্রবাহে শূদ্রের সন্ন্যাস ধর্মে প্রবেশ করার বাধা-নিষেধ আর নেই।

বিচারপতির অভিমতে পরিবর্তিত ও পরিবর্তনশীল সমাজে একজন শূদ্রও সন্ন্যাসী হতে পারে আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় আচরণের মাধ্যমে সে যদি উচ্চমার্গে উঠে থাকতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বিচারপতি স্বামী বিবেকানন্দের উল্লেখ করেন, জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন কায়স্থ (দত্ত) এবং রাজকুমার বনাম বিশ্বেশ্বর মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায় অনুসারে কায়স্থকে শূদ্র বলে ঘোষণাও করা হয়েছিল, সেই বিবেকানন্দকে সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বনে আবর্তিত করেছিলেন স্বয়ং পরমহংস রামকৃষ্ণ এবং তিনি বিবেকানন্দকে তাঁর প্রধান শিষ্যও করেন। বিচারপতির মতে শূদ্র হিসাবে জন্ম নেওয়ার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণে স্বামীজীর যোগ্যতা ছিল না একথা কল্পনাই করা যায় না।

সবশেষে বিচারপতি একথা বলে প্রসঙ্গের ইতি করেন যে একটা যুগ ছিল যখন শূদ্রের অধিকার ছিল না সন্ন্যাস গ্রহণের, কিন্তু যুগধর্ম পাল্টে গেছে, অতএব কৃষ্ণা সিং-এর আপত্তি খারিজ করা হচ্ছে।

এই কাহিনী থেকে জানা যাচ্ছে যে আম্বেদকর যে বীজ রোপন করে গেছেন আজ তা মহীরুহে পরিণত হতে চলেছে।

আদম-সুমারি থেকে দেখা যায় যে, ভারতে ব্রাহ্মণদের তুলনায় অব্রাহ্মণদের সংখ্যা অনেকগুণ বেশি, তাদের স্বার্থ দেখাই সমাজের কাজ, রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

*　　　*　　　*

তুলনামূলক বিচার করা আমাদের চরিত্রধর্ম। তাই আম্বেদ-করের বহুমাত্রিক জীবনের বর্ণনা নানা উপমা দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও, মনে হয় তাঁর সব পরিচয় সার্থকভাবে তুলে ধরা যায় নি।

আমার মনে হয় আম্বেদকরের পুরুষ সত্ত্বাকে তুলনা করা যায় একমাত্র একটি চরিত্রের সঙ্গে, তিনি হলেন মহাভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র মহাবীর কর্ণ।

জন্মসূত্রে তিনি যাই হোন না কেন, কর্ণের জাগতিক পরিচয় ছিল অধিরথ পুত্র। সারথির ছেলে ক্ষাত্রসমাজের চোখে নিচ-বর্ণের মানুষ। আম্বেদকরও কর্ণের মত অতুলনীয় শোর্য-বীর্যের অধিকারী হয়েও ভারতীয় সমাজে অবহেলিত, তাঁর যোগ্য সম্মান তিনি ততটা পান নি যতটা পাওয়া উচিত ছিল।

কর্ণের মত আম্বেদকরও ছিলেন বঞ্চিতের ও হতাশের দলের বিড়ম্বিত নায়ক। এবং বিবেকবান ব্যক্তিদের কাছে স্বমহিমায় উজ্জ্বল এক জ্যোতিষ্ক।

গ্রন্থপঞ্জী

১। বেদ

২। উপনিষদ

৩। আম্বেদকর লাইফ অ্যান্ড মিশন—ধনঞ্জয় কীর

৪। হিন্দু-ল—প্রাক্তন বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আনন্দময় ভট্টাচার্য।

৫। ভারতের সংবিধান (বাংলা), ভারত সরকার, বিধি ও ন্যায় মন্ত্রণালয়।

———